তাক্বলিদ

ইসলামের বুনিয়াদ ও তাক্বলিদের আবশ্যকতা

মূল: মুফতি সাইয়্যিদ আহমদ পালনপুরী

ও

মুফতি আফজাল হুসাইন ইলিয়াস

অনুবাদ: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

KAA Publication

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সিলেট।

তাক্বলিদ

ইসলামের বুনিয়াদ ও তাক্বলিদের আবশ্যকতা

মূল: মুফতি সাইয়্যিদ আহমদ পালনপুরী

ও

মুফতি আফজাল হুসাইন ইলিয়াস

অনুবাদ: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

KAA Publication

খানকায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সিলেট।

বিশেষ ইন্টারনেট সংস্করণ

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়ার পক্ষ থেকে আরজ

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর অপরিসীম কৃপায় খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়ার প্রকাশনা বিভাগ থেকে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের বঙ্গানুবাদ সম্পন্ন হয়েছে।

দ্বীনের বুনিয়াদ ও তাক্বলিদের গুরুত্ব সম্পর্কিত শীর্ষক এ মূল গ্রন্থটি ইংরেজিতে রচিত। আল্লামা সাইয়্যিদ আহমাদ পালনপুরী দা.বা. কর্তৃক তাক্বলিদের ওপর প্রদানকৃত তিনটি বক্তৃতার সারসংক্ষেপ গ্রন্থটিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ বয়ানগুলোর ২টি ভারতে ও ১টি ইংল্যান্ডে সাধারণ শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং দ্বীনের বুনিয়াদ ও তাক্বলিদের জরুরত সম্পর্কে সর্বসাধারণের বোধগম্য এই কিতাবটি খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়ার গবেষণা বিভাগ থেকে বঙ্গানুবাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আমরা আশাকরি আজকের বহুতরের ফিতনার যুগে সঠিক দ্বীনদারিত্বের ওপর ঠিকে থাকতে গ্রন্থটি সহায়ক হবে।

গ্রন্থ প্রকাশনার সাথে জড়িত সবাইকে আন্তরিক মুবারকবাদ জ্ঞাপন করছি। খাস করে গ্রন্থের অনুবাদক ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তিনি গ্রন্থটির কম্পিউটার কম্পোজ ও অঙ্গসজ্জাও করেছেন। দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা যেনো সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকল চেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী

পরিচালক, খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা বিভাগ

আলী সেন্টার, সুবিদবাজার, সিলেট।

বিষয়সূচি

প্রাক কথন ৭
গ্রন্থকার সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয় ৯
বঙ্গানুবাদকের আরজ ১০
ইসলামের বুনিয়াদ ১১
আল্লাহর কিতাব কুরআনুল করীম ১১
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ১২
উম্মতের ইজমা' [মতৈক্য] ১২
হাদিসের মুনকিরীন বা পরিত্যাগকারী ১৫
গায়র মুক্বাল্লিদীন [তাক্বলিদ অস্বীকারকারী] ১৬
শিয়া সম্প্রদায় ১৭
মিস্টার মওদুদী গ্রুপ ১৮
শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রাহ.) ও গায়র মুক্বাল্লিদীন ১৯
তাক্বলিদের গুরুত্ব ২০
সালাফিয়্যাহ - একটি প্রতারণা ২১
গায়র মুক্বাল্লিদীনের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য ২৩
আহলে হাদিস ২৪
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত ২৫
হাদিস, ইজমা' ও ক্বিয়াসের দালায়িল ২৬
দ্বীন একটি, শরীয়ত অনেক ২৬
বর্তমান উম্মতই একমাত্র মুসলমান ২৭
উসূল [মূল] ও ফুরূ [শরীয়ত] ২৭
দ্বীন ও শরীয়তে রিয়া'য়াত (চিন্তা-বিবেচনা) ২৮
আহলে কুরআন ২৯
শিয়া - হাদিসের সর্বাধিক বড়ো প্রত্যাখ্যানকারী ৩০
আহলে হাদিস ও ইজমার ইনকার [বিশ্বাসীদের মতৈক্য] ৩১
আহলে হাদিসদের সঠিক নাম কি? ৩১
এদেরকে কী লা-মাজহাবী বলা যায়? ৩২
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত ৩৩
হাদিস ও সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য ৩৩
সুন্নাতের অর্থ ৩৩
মাদ্দাতুল ইফতিরাক্ব [পার্থক্য দু'টি] ৩৪
হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সুন্নাত ৩৪

হাদিস ও সুন্নাতের মধ্যে সাদৃশ্য [মাদ্দাতুল ইজতিমা’] ৩৬
দু’টি কারণে ‘আহলে হাদিস’ হওয়া গ্রহণযোগ্য নয় ৩৬
একটি চ্যালেঞ্জ ৩৭
হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সুন্নাত ৩৮
‘আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত’ নাম ৩৯
দ্বীনের তিনটি উসূল [মূলসূত্র] ৪০
কুরআন, হাদিস, ইজমা ও ক্বিয়াস পরস্পরগ্রথিত ৪১
সকল হাদিস কুরআনের সঙ্গে যুক্ত ৪২
ইজমাও কুরআন ও হাদিসের সঙ্গে যুক্ত ৪৩
তিন উসূলের সঙ্গে ক্বিয়াসের সংযুক্তি কিভাবে হলো ৪৪
সূরা নাহলের আয়াতের মধ্যে ক্বিয়াসের প্রমাণ ৪৫
ভ্রান্তির এক বিরাট সূত্র হলো ভ্রান্তদের তাক্বলিদ ৪৭
তাক্বলিদের জন্য দু’টি জিনিস জরুরী ৪৯
তাক্বলিদের উযূব [ওয়াজিবসমূহ] ৫৩
মুহাজিরীন ও আনসারদের অনুসরণ কারা করেন? ৫৩
একটি অভিযোগ ও এর জবাব ৫৭
হুজ্জিয়াতে হাদিসের প্রমাণ: একটি অভিযোগ ৫৭
আখবার-এ ইনশা যুক্ত ৫৮
তাক্বলিদ: একমাত্র রাস্তা ৬০
৩টি বিষয়ে তাক্বলিদ আবশ্যিক ৬১
এক হাদিস: দু’টি অর্থ ৬১
তাক্বলিদের ‘দলিলাদি’ দাবি করা সঠিক নয় ৬২
তাক্বলিদের উজূব ৬৩
ভ্রান্ত্রির একটি বড়ো কারণ: ভ্রান্তদের তাক্বলিদ ৬৪
চার ইমামের তাক্বলিদের ওপর উম্মতের ইজমা’ ৬৯
কখন তাক্বলিদ বৈধ নয়? ৬৯
মাসাঈল তিন ধরনের ৭৫
গায়র মুক্বাল্লিদ ফিরক্বার ব্যাপারে শরঈ হুকুম ৭৫
আহলে সুন্নাতের ইজমা’র কর্তৃত্ব ৭৯
সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুমের উচ্চ মর্যাদা ৮৪
একটি হাদিসের ইসতিনাদ (বিশ্লেষণ) ৯৩

প্রাক কথন

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর গুণগান করছি। তাঁর সাহায্য চাই এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থী। আমরা তাঁর উপর ঈমান এনেছি এবং একমাত্র তাঁরই ওপর ভরসা রাখি। আমাদের অভ্যন্তরস্থ দুষ্কর্ম ও পাপকার্য থেকে তাঁরই নিকট পানাহ চাই। আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করেন সে কখনো পথভ্রষ্ট হয় না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর কেউ নেই এবং তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি এটাও সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আনুগত্যশীল বান্দা এবং তিনিই হচ্ছেন আল্লাহপ্রেরিত সর্বশেষ রাসূল। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও রহমত নাজিল হোক তাঁর প্রতি, তাঁর আহলে আওলাদের প্রতি ও তাঁর আসহাবে কিরামের প্রতি। আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলের মর্যাদাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করুন।

আল্লামা সাইয়্যিদ আহমদ পালনপুরী দা.বা. প্রারম্ভেই উল্লেখ করেছেন, গ্রন্থটি মূলত তিনটি বক্তৃতার সারসংক্ষেপ। এ বক্তৃতাগুলোর দু'টি ভারতে ও একটি যুক্তরাজ্যে প্রদান করেছিলেন। অবশ্য গ্রন্থে হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিখ্যাত কিতাব 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'র আলোকেও ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে।

হাদীস পরিত্যাগকারী ও তাক্বলিদ অস্বীকারকারীদের ভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকতে বইটি সহায়ক হবে। সুতরাং এতে উল্লেখিত ৩টি বক্তৃতা ছাড়াও তাক্বলিদের অনুসরণের গুরুত্ব সম্পর্কে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সতর্কবাণী, লা-মাজহাবীদের ব্যাপারে শরঈ সিদ্ধান্ত, সাহাবায়ে কিরাম রিদ্বওয়ানিল্লাহি তা'আলা আজমাঈনের উচ্চতর মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা এসেছে।

দ্বীনের মৌলিক বিষয় তথা: কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও ক্বিয়াসের ওপর সরল ভাষায় ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে সাধারণ পাঠকসহ সকলের জন্য বোধগম্য করে। এরপর তাক্বলিদের জরুরত ও কার্যকারিতার ওপর

আলোচনা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা আল্লামা সাইয়্যিদ আহমদ পালনপুরী সাহেবের চেষ্টাকে গ্রহণ করুন এবং আমাদেরকে রক্ষা করুন বর্তমান সালাফি বা গায়র মুক্বাল্লিদ বা আহলে হাদিস কিংবা লা-মাজহাবীদের অন্ধকার মতবাদ ও ধারণাসমূহ থেকে।

এ. এইচ. ইলিয়াস (মুফতি)

১৪২৭ / ২০০৬

গ্রন্থকার সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত মাওলানা হাফিজ মুফতি সাইয়্যিদ আহমদ পালনপুরী বিশ্ববিখ্যাত দারুল উলূম দেওবন্দে লেখাপড়া করেন। গুজরাটের জামিয়া আশরাফিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতার মাধ্যমে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। দীর্ঘ ৯ বছর সেখানে শিক্ষকতার পর দারুল উলূম দেওবন্দে শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। এখানেই গত ৩২ বছর যাবৎ দারসে নিযামীর প্রতিটি বিষয়ের ওপর সফলভাবে শিক্ষকতা করে আসছেন। সিহা সিত্তার বিখ্যাত কিতাব তিরমিযী শরীফের ওপর তাঁর ব্যাখ্যামূলক দারস এখন সর্বাধিক জনপ্রিয়। প্রায় দিনই কমবেশি এক হাজার ছাত্র এই দারসে যোগ দিয়ে উপকৃত হচ্ছেন। সুখের বিষয় যে, তাঁর এসব দারস্ লিখিতভাবে সংরক্ষিত হচ্ছে এবং শীঘ্রই তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে। ছাত্রদের যারা এসব প্রজ্ঞাপূর্ণ দারসে যোগ দিচ্ছেন তারাই হযরতকে 'আল্লামা' এবং 'বাহরুল উলূম' উপাধিতে ভূষিত করছেন।

হযরত পালনপুরী দা.বা. আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, কানাডা, যাম্বিয়া, জিম্বাবুয়ে, মালাওয়ী, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং তুর্কির বিভিন্ন শহরে ভ্রমণ করেছেন। তিনি অনেক লেখালেখি করেছেন। বিশেষ করে গবেষকদের জন্য তাঁর লেখার মূল্য বিরাট।

হযরত পালনপুরী দা. বা. আরবি, ফার্সি, উর্দু, গুজরাটি ও ইংরেজি এই ৫টি ভাষায় পারদর্শী। বর্তমানে হযরতের রচিত ৫টি কিতাব উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাঁর লেখার ব্যাপ্তি তাফসির, হাদিস, উসূলে তাফসির, উসূলে হাদিস, হাদিস সংগ্রহের ইতিহাস, সরফ, নাহু, ফিক্হ, দর্শন ও মানতিক ইত্যাদি বিষয়সমূহে বিস্তৃত। তাঁর সর্বশেষ মহৎ রচনা হলো ৫ খণ্ডে সমাপ্ত 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'রাহমাতুল্লাহিল ওয়াসিয়া'। এর প্রতিটি খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮৫০-এরও বেশি।

এ বছর (১৪২৬-২০০৫) হযরত উস্তাদ আল্লামা সাইয়্যিদ পালনপুরীর 'রাহমাতুল্লাহিল ওয়াসিয়া'র ইংরেজি অনুবাদের কাজে আমরা হাত দিচ্ছি ইনশাআল্লাহ। আমরা আপনাদের নিকট দু'আ প্রার্থী।

এ. এইচ. ইলিয়াস (মুফতি)

বঙ্গানুবাদকের আরজ

হযরত মাওলানা হাফিজ মুফতি পালনপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ‘দ্বীন কি বুনিয়াদে আওর তাক্বলিদ কি জরুরাত’ -এর ইংরেজি একটি অনুবাদ ইন্টারনেটে প্রকাশিত হয়। মুফতি এ. এইচ. ইলিয়াস কর্তৃক অনূদিত এই মূল্যবান বইয়ের বঙ্গানুবাদ সকল স্তরের পাঠকদের জন্য উপকারী হবে মনে করে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় অনুবাদ করার কাজে হাত দিই।

বইটি ছোট হলেও তাক্বলিদের ব্যাখ্যা ও জরুরতের ওপর খুব সুন্দর সরল ভাষায় বর্ণনা এসেছে। অবশ্যই শরয়ী শক্তিশালী দলিলের ওপর নির্ভর করে এটি রচিত। গ্রন্থকার সকল ক্ষেত্রে সূত্র উল্লেখ করেন নি। এছাড়া কুরআন ও হাদিস শরীফের অনুবাদ দিয়েছেন মাত্র। আমরা কুরআন শরীফের উদ্ধৃত বেশ কিছু আয়তের মূল আরবিসহ বঙ্গানুবাদ দিয়েছি।

বহুতরের এ ফিতনার যুগে সভা-সমাবেশ, ওয়াজ-নসিহত ও লেখালেখির মাধ্যমে পুরো উম্মতকে নতুন নতুন বাতিল ফিরক্বাসমূহ সম্পর্কে সকর্ত করা উলামায়ে কিরাম ও সচেতন দ্বীনদার ব্যক্তিদের দায়িত্ব। আলহামদুলিল্লাহ! ইতোমধ্যে এ সম্পর্কে বেশ সাড়া জেগেছে। কিন্তু যথেষ্ট মোটেই নয়। আহলে হাদিস, সালাফি, মওদুদী ইত্যাদি লা-মাজহাবীদের তৎপরতা এখন বাংলাদেশেও তুঙ্গে। এদের ভ্রান্তি ও দ্বীনের ভুল ব্যাখ্যা থেকে বিভ্রান্ত হচ্ছে নতুন প্রজন্মের অসংখ্য যুবক-যুবতী।

সুতরাং নতুন প্রজন্মকে বাঁচাতে হলে আমাদেরকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

সবশেষে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি গ্রন্থ প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত সবাইকে। ভুল-ক্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। আল্লাহ তা’আলা আমাদের সকল প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমিন।

অনুবাদক

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইসলামের বুনিয়াদ

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

"যে কেউ রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে সে দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব, আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান।" [সূরা নিসা : ১১৫]

তিনটি মৌলিক সূত্রের ওপর দ্বীন ইসলামের ভিত্তি:

১. আল্লাহর কিতাব।

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত।

৩. উম্মতের ইজমা।

১. আল্লাহর কিতাব কুরআনুল করীম

আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র কিতাবে যাকিছু অবতরণ করেছেন তার ওপরই পুরো দ্বীনের ভিত্তি। এটা হচ্ছে দ্বীন ইসলামের সর্বপ্রথম সূত্র। বাকি সবকিছুই এর আলোকে ওজন করা হয়। কুরআনে কারীমকে অস্বীকার হলো কুফরী।

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত

আল্লাহর নবীর বাণী ও তাঁর [নিজের ও সমর্থিত] আমলের নাম সুন্নাত। এটাও দ্বীনের একটি হুজ্জাত বা মূল ভিত্তি। শরীয়তের এক বিরাট অংশ এর ওপর ভিত্তিশীল। কুরআনে এর অনেক প্রমাণ বিদ্যমান। সুন্নাতে রাসূলকে দ্বীন হিসাবে গ্রহণ ও এর ওপর আমল করা একান্ত জরুরী।

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

" .. রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক ..." [হাশর : ৭]

২. তিনি আরো বলেন:

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

"যে লোক রাসূলের হুকুম মান্য করবে সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল। আর যে লোক বিমুখতা অবলম্বন করল, আমি আপনাকে (হে মুহাম্মদ), তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাই নি।" [নিসা : ৮০]

অনুরূপ আরো অনেক আয়াত আছে যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসকে দ্বীনের হুজ্জাত হওয়ার প্রমাণ উপস্থাপন করেছে।

৩. উম্মাতের ইজমা [মতৈক্য]

যা কিছুর ওপর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতৈক্য হয়েছে তাকে ইজমা বলে- দ্বীনের ক্ষেত্রে এটাও একটি হুজ্জাত বা মূল ভিত্তি।

এটার প্রমাণ হিসাবে ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কুরআন শরীফের নিচের আয়াতটি উপস্থাপন করেছেন।

“যে কেউ রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে সে দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব, আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান।” [সূরা নিসা : ১১৫]

এই আয়াতটি অত্যন্ত সমন্বিত। দ্বীনের হুজ্জাত সম্পর্কিত তিনটি বিষয়ই এতে একত্রে বর্ণিত হয়েছে।

দলিল হিসেবে উপরোক্ত আয়াতকে উপস্থাপন দ্বীনের ওপর ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুগভীর প্রজ্ঞার পরিচায়ক। তিনি যদি এই দলিলটি উপস্থাপন না করতেন তাহলে হয়তো আমরা তা খুঁজে পেতাম না। লক্ষ করুন:

* **“রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করা”** -বলতে সুন্নাতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

* **“সরল পথ বা হিদায়াত প্রকাশিত হওয়ার পর”** -বলতে পবিত্র কুরআনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সুতরাং হাদিস বা সুন্নাতের বিরোধিতা করলে জাহান্নামী হতে হবে। যদি কেউ বলে, আমার জন্য কুরআনই যথেষ্ট, আমার আর কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই এবং আমি একমাত্র কুরআন ছাড়া আর কিছুই অনুসরণ করবো না- তাহলে, আল্লাহ তা’আলা তাকেই বলেন:

“ ... এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব”।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ঐ ব্যক্তি কুরআন অনুসরণ করার পরও জাহান্নামী হবে! এর কারণ হলো সে রাসূলের বিরোধিতা করেছে। কুরআনকে যেভাবে গ্রহণ করা একান্ত জরুরী, ঠিক সেরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মান্য করাও একান্ত জরুরী।

সুতরাং এটা সুস্পষ্ট হলো যে, কেউ কুরআনের ওপর আমল বা অনুসরণ করতে পারবে না- একই সময় হাদিস ও সুন্নাতকে উপেক্ষা করে। যাকিছু কুরআনে করীমে বর্ণিত হয়েছে তার ব্যাখ্যাই হচ্ছে হাদিস শরীফ। এ যেমন কুরআনের তাফসীর।

কুরআন শরীফ আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছে নামায, যাকাত ইত্যাদি আদায় করতে। আর এসব নির্দেশের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা একমাত্র হাদিস শরীফেই এসেছে। আর এখানেই শেষ নয়।

উক্ত আয়াতের মধ্যে তৃতীয় আরেকটি অংশ আছে:

" ... এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে ..."

অর্থাৎ যারা মু'মিনদের পথ অনুসরণ করে না তারাও ঐ প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত হবে। মোটকথা উক্ত আয়াতে তিনটি বিষয় সম্পর্কে নির্দেশ এসেছে:

১. কুরআনের হিদায়াত অনুসরণ করো।

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করো।

৩. মু'মিনদের পথ অনুসরণ করো।

যে কেউ উক্ত আয়াতের নির্দেশসমূহ পূর্ণাঙ্গরূপে অনুসরণ করবেন, তিনি হাক্ব তথা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন ও নিশ্চিতভাবে নাযাতপ্রাপ্ত হবেন। আর যারা আয়াতের কিছু অংশ গ্রহণ ও অনুসরণ করেন এবং অন্য এক বা একাধিক অংশ বাদ দেন, তারা বিরাট বিপদগ্রস্ত হয়েছেন।

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

"তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিয়দংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস কর? যারা এরূপ করে পার্থিব জীবনে দুর্গতি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই। কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছুয়ে দেওয়া হবে " [সূরা বাক্বারা : ৮৫]

'মুসলমানদের' মধ্যে এমন কেউ নেই যে কুরআনকে অস্বীকার করে। কুরআনের একটি অংশও যদি কেউ অস্বীকার করে তাহলে তো সে সাথে সাথেই ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। এমনকি [চাহিদামাফিক]

কুরআনকে ‘পুনর্ব্যাখ্যা’ করাও কুফর না হলেও ‘ফিস্‌ক’ [সীমালঙ্ঘন] এর অন্তর্ভুক্ত কাজ হবে।

হাদিসের মুনকিরীন বা পরিত্যাগকারী

দ্বীনের দ্বিতীয় মূল ভিত্তি হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস। কিন্তু এখানে শুরু হয় ইখতিলাফ [মতপার্থক্য]। একদল আছে যারা নিজেদেরকে ‘আহলে কুরআন’ বলে পরিচয় দেয়। তাদের বিশ্বাস দ্বীনের একমাত্র সূত্র হচ্ছে কুরআনে করীম। তারা বলে, হাদিসসমূহ সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য নয়। সুতরাং হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের একদল নৈর্বাচনিক পন্থাবলম্বনে বিশ্বাসী। অপর আরেক দল সকল হাদিসকেই পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করে বসেছে।

তারা বলে, আমরা আহলুল কুরআন [কুরআনের লোক]। কিন্তু এ খেতাবটি আসলে প্রতারণামূলক। বাস্তবে তারা হচ্ছে কুরআন থেকে সর্বাধিক ‘দূরের’ লোক। সুতরাং মুসলমানরা তাদেরকে যথোপযুক্তভাবে ‘মুনকিরীনুল হাদিস’ [হাদিস প্রত্যাখ্যানকারী] হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

এরা আহলুস সুন্নাহের অন্তর্ভুক্ত নয়। বাস্তবে এরা ঈমানদার কি না, এ সম্পর্কে বিরাট সন্দেহ আছে!

গায়র মুক্বাল্লিদীন [তাক্বলিদ অস্বীকারকারী]

এরপর আসে দ্বিতীয় আরেক দল। তারা বলে, “ইসলামের ভিত্তি [শুধুমাত্র] কুরআন ও হাদিস!”

এরা উম্মতের মতৈক্য বা ইজমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাদের এই বিরোধিতা এ পর্যায়ে পৌঁছুয়েছে যে, অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরামের ইজমাকেও প্রত্যাখ্যান করেছে! কুরআন ও হাদিস সম্পর্কে তাদের দাবি অনেকটা উপরে বর্ণিত প্রথম দলের মতোই। কথা বা শব্দব্যবহার সঠিক, কিন্তু অন্তর্নিহিত অর্থ প্রতারণামূলকভাবে বাতিল।

এরা নিজেদেরকে 'আহলে হাদিস' বলে পরিচয় দেয়, ঠিক যেরূপ প্রথম দল নিজেদেরকে 'আহলে কুরআন' বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। আহলে সুন্নাত এদেরকে 'গায়র মুক্বাল্লিদ' হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। আরবরা এদেরকে 'লা-মাযহাবিয়া' বলে সম্বোধন করেন।[১]

এখন এরা নিজেদেরকে 'সালাফি' বলে পরিচয় দেয়। তারা এভাবেই নিজেদেরকে বিভিন্ন নামে পরিচয় দিয়ে থাকে- আজ একটি অন্যদিন আরেকটি।

এ দলের ভিত্তি

এরা কুরআন গ্রহণ করেছে। এরপর তারা দাবি করে, হাদিসও গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু এখানে এসে তারা নিজেদের নুতন রাস্তা আবিষ্কার করেছে। তারা হাদিসসমূহকে 'সহীহ' [বিশুদ্ধ] ও 'জঈফ'[২] [দুর্বল] এ দু'টি ক্লাসে বিভক্ত করেছে। তারা সহীহগুলো গ্রহণ করে ও জঈফগুলো প্রত্যাখ্যান করে। আর এই বিভক্তিকরণ হয় তাদের ইচ্ছেমাফিক। হাদিসের ইমামদের কর্তৃক শ্রেণিভুক্তকরণকে তারা গ্রহণ করে না। সুতরাং এটাই হলো তাদের নিজস্ব-রীতি মুতাবিক হাদিস অনুসরণের সংক্ষিপ্তবৃত্তি।

শিয়া সম্প্রদায়

এটা বিখ্যাত একটি দল। এরাও ইজমা প্রত্যাখ্যান করে। এরা কুরআন 'তাদের ইচ্ছেমতো' গ্রহণ করে। তাদের কেউ কেউ আমাদের কাছে সংরক্ষিত কুরআনকে মোটেই মানে না। অপর কেউ কেউ বলে, আমাদের কুরআন নাকি অপূর্ণ। গুপ্ত ইমাম তাদের কুরআন নিয়ে

---

[১]সিরিয়ার সাইদ রামাদ্বান এদের সম্পর্কে 'আল-লা মাযহাবিয়্যা ওয়া কুতূরাতিহা ফী হামদি শারীয়াতিল ইসলামিয়্যা' শিরোনামে একটি সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেছেন। শিরোনামের অর্থ হলো: 'লা-মাজহাবী দলসমূহ ও তাদের কর্তৃক ইসলামের মৌলিকত্ব ধ্বংসের আশঙ্কা'।

[২]নাসিরুদ্দীন আলবানি নামক স্ব-শিক্ষিত অপরিপক্ক হাদিসবিশারদের কাজ এটি। এতে পুরো উম্মার মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। আলবানির এসব কাজের ফিরিস্তি জানতে পাঠ করুন, খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া থেকে প্রকাশিত প্রামাণ্যগ্রন্থ 'চার মাজহাবের আলো'। ইন্টারনেট ডাউনলোড লিংক:
https://archive.org/search.php?query=Engineer%20Azizul%20Bari

নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন। এ কথাটি অবশ্য তারা খোলাখুলিভাবে বলে না। কারণ একথা বললে তো তাদের আসল স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়বে! তাদের কিতাবসমূহ দেখুন। এতে যা আজেবাজে কথা আছে তা পাঠ করে আপনি অবশ্যই আৎকে ওঠবেন।

এরাই হচ্ছে এ উম্মার ইয়াহুদ। তাদের বিশ্বাসগুলো সত্যিই হাস্যকর। তাদের পুরো ধর্মবিশ্বাসই রহস্যাবৃত ও অন্ধকার গোপনীয়তার উপর নির্ভরশীল। তারা একে বলে 'তাকিয়্যাহ'- যা মূলত নিফাক [মুনাফিকী] ছাড়া আর কিছুই নয়।

তারা হাদিস মানে। কিন্তু তারা শুধু তাদের সংগ্রহিত হাদিস ব্যবহার করে। তারা ইজমা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছে। সুতরাং উম্মতের প্রথম ইজমা তথা আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকে তারা মানে না। অথচ ঐ সময় সমগ্র উম্মত তাঁর হাতে বাইআত [আনুগত্য] গ্রহণ করেছেন। এরপর বাইআত গ্রহণ করেছেন যথাক্রমে হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু, হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাতে। এমনকি আলী ও আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা প্রথম তিন খলিফার হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এটা মেনে নিয়েছেন। কিন্তু এরা মানে না। অথচ ঐ সময় তারা অনুপস্থিত ছিলো।

এদের বিরুদ্ধে প্রথম ও সর্বাধিক প্রমাণ হলো এটাই। তারা অনেক বছর পর বিভিন্ন সন্দিগ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। এটা আলাদা একটি দীর্ঘ আলোচনা।

দ্বীনের ব্যাপারে এদের 'অন্যান্য সূত্র' আছে। আমরা এ পর্যায়ে এগুলো নিয়ে মাধা ঘামাবো না।

মোটকথা, তারা একটি আলাদা একক দল। এমনকি তারা নিজেরাই এটা স্বীকার করে নিয়েছে। তাদের নিজস্ব 'ধর্ম' আছে। তাদের এই ধর্ম দ্বীন ইসলাম থেকে এতটুকু দূরে, যেটুকু দূরে অবস্থান করে খ্রিস্টবাদ ও ইয়াহুদীবাদ।

মিস্টার মওদুদী গ্রুপ

মিস্টার মওদুদী প্রথমে সঠিক রাস্তায় ছিলেন। তিনি ‘উচ্চশিক্ষিত ফেলো’ হিসেবে পরিচিতি অর্জন করেন। কিছুদিনের জন্য তিনি মুফতি কিফায়াতুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট অধ্যয়ন করেছিলেন। তার প্রাথমিক কিছু কাজ ভালো ছিলো। পরে তিনি জামাআতে ইসলামী দল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি খিলাফত বিষয় নিয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। ঐ সময় বেশ ক’জন নেতৃস্থানীয় উলামায়ে কিরামও তাকে সমর্থন করেছিলেন। তার মুভমেন্টের প্রতি অতি-আচ্ছন্নতাই শেষ পর্যন্ত এর ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তার শেষ জীবনের লেখাগুলো থেকে এটা আঁচ করা যায়।

মোটকথা, প্রথমে তিনি তাক্বলিদের সমালোচনা করেন এবং পরে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন (আর এটাই মুক্তচিন্তার পথ উন্মোচন করে)। সর্বশেষ, তিনি সাহাবায়ে কিরামের ইজমাও প্রত্যাখ্যান করেছেন। তার সমালোচনায়, আসহাবে কিরামের সর্বোচ্চ মর্যাদার বিষয়টিও বিবেচনায় আনেন নি। এমনকি সবশেষে, আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস্‌সালামও তার সমালোচনা থেকে রেহাই পান নি!

এখন এসব বিষয় তারা গোপন রাখতে চেষ্টা করছে। কিন্তু সময় সময় এগুলো পর্দার আড়াল থেকে উঁকিঝুকি দেয় ঠিকই!

তারা দাবি করে: ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাড়া কারো জেহনি গোলামি বৈধ নয়।’ -এটা এ পর্যন্ত বর্ণিত সকল দলেরই দাবি। তাদের কথা ও মতবাদ এরূপই বড়ো- কিন্তু বাস্তবে এগুলো ভাসাভাসা ও প্রতারণামূলক।

সুতরাং এগুলো হলো আজকের বিশ্বের তিনটি দল যারা সাহাবায়ে কিরাম ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের ইজমাকে অস্বীকার করে।

মুহাম্মদ পালান হক্কানী [মুহাম্মদ তাঁর নাম, পালান তাঁর পিতার নাম] একটি কিতাব রচনা করেছেন: “গায়র মুক্বাল্লিদীন ক্যা খুলাফায়ে রাশিদীন ছে ইখতিলাফ।” তিনি এতে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যুগের সাহাবার ইজমার মাধ্যমে খুলাফায়ে রাশিদীন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন্ কোন্ মাসআলা ‘সালাফিরা’ বা যে নামেই আমরা এদের সম্বোধন করি না কোনো, প্রত্যাখ্যান করেছে।

সুতরাং এ গ্রুপকে প্রথমোক্ত আয়াতের আলোকে ওজন করে দেখুন।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রাহ.) ও গায়র মুক্বাল্লিদীন

শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন উম্মতের উচ্চ পর্যায়ের মুহাদ্দিসীনের মধ্যে একজন। তিনি হচ্ছেন 'মুসনিদুল হিন্দ'- অর্থাৎ উপমহাদেশের সকল হাদিসের সনদ তাঁর মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। তাদের মতামতকে শক্ত করার জন্য হিন্দুস্তানের আহলে হাদিসরা দাবি করে থাকে, তিনি ছিলেন তাদের দলভুক্ত। এটা তাদের একটি সচরাচর কৌশল। এভাবেই তারা সাধারণ সরল-সহজ মুসলমানদের ধোঁকা দিয়ে থাকে।

শুনুন! যারা এই উম্মার সঙ্গে যুক্ত নও তারা এরূপ ক্যান্সার দ্বারা পথভ্রান্ত হবে। যাক, এটা সহজে বুঝতে, তাঁর [শাহ ওয়ালিউল্লাহ সাহেবের] রচিত 'হুজ্জাতুল্লাহুল বালিগাহ' গ্রন্থ পাঠ করা যায়। যেখানে তিনি এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি দু'টি দল সম্পর্কে লিখেছেন: 'আহলুর রা'ঈ' ও 'আহলুল হাদিস'।

আহলুর রা'ঈর ইমামগণ হলেন ইমাম শা'বি, ইব্রাহিম নাখয়ী, আওযায়ী, ইবনে আবি লায়লা, শুবরুমাহ, আবু হানিফা ও তাঁর ছাত্রবৃন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম।

আসহাবুল হাদিস (বা আহলুল হাদিস) যারা ছিলেন তাঁরা হলেন মদীনার ৭ জন- ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম হাম্বল, সুফিয়ান সওরী, ইবনে মুবারক প্রমুখ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম।

তাক্বলিদের গুরুত্ব

আহলুর রা'ঈর ফিক্হ ইমাম আবু হানিফা সংগ্রহ করেন। এরপর এই দলের মধ্যে তেমন কোনো বড়ো মতপার্থক্য হয় নি।

আসহাবুল হাদিসদের মধ্যে তাদের ফিক্হ নিয়ে অনেক মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। তাঁদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে বেশ কয়েকটি মাজহাব। ক্রমান্বয়ে

এই মাজহাবগুলো সর্বশেষ চারটিতে এসে দাঁড়ায়। আর এভাবেই চার মাজহাব প্রতিষ্ঠিত ও গ্রহণীয় হয়। এই চার মাজহাবের মধ্যেই সকল আইম্মার জ্ঞান ও সাহাবায়ে কিরামের ফাতওয়াসমূহ একত্রিত হয়েছে। সবশেষে চার মাজহাবের তাক্বলিদ (অনুসরণ) উম্মতের নিরঙ্কুশ মতৈক্যের মাধ্যমে গ্রহণীয় হয়। এই তাক্বলিদের মধ্যে আছে বিরাট প্রজ্ঞা ও নিরাপত্তা।

এরপর শাহ সাহেব লিখেছেন:

“মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে, উপরে উল্লেখিত ‘আসহাবুল হাদিস’ আর এ যুগে উদ্ভূত দল যারা নিজেদেরকে ‘আহলে হাদিস’ বলে থাকে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আজকের আহলে হাদিস আগের যুগের ‘জাহিরিয়্যা’ ফিরকার মতো। এ লোকগুলো হলো ‘লা-মাযহাবিয়্যা’ ও ‘গায়র মুক্বাল্লিদীন’। তারা আসহাবে কিরাম ও আইম্মার ইজমা গ্রহণ করে নি। তারা মানে নি, আসহাবে কিরামের আছার [বাণী ও আমল], না তারা মেনেছে দ্বীনের হুজ্জাত হিসাবে ক্বিয়াসকে (সাদৃশ্যজণিত যৌক্তিকতা)। এরা আসহাবুল হাদিসদের অন্তর্ভুক্ত নয়।”

অপর আরেক কিতাব, ‘আল-আক্বদুল জায়্যিদ’-এ, তিনি এ বিষয়ের উপর গভীর আলোচনা করেছেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে।

সালাফিয়্যা - একটি প্রতারণা

আধুনিক যুগে উক্ত গায়র মুক্বাল্লিদ ফিরকা নতুন এক নাম ধারণ করেছে, তা হলো ‘সালাফি’। কিন্তু তারা একই পুরাতন বস্তুকে নতুন পোশাকে আবৃত করেছে মাত্র। অনেক তাজা ও মুক্ত যুবক-যুবতী তাদের ফাঁদে আটকা পড়েছে। ফলে হঠাৎ তারা লাভ করেছে তাজা বাতাস এবং অধিকাংশ ভ্রান্ত ফিরকার মতোই, অনুসারীদের প্রায় সবাই দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ। সাধারণ মানুষ উসূলুদ্দীন [ধর্মের নিয়ম-কানুন] এর খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে অবগত নয়। সুতরাং তাদের সম্মুখে আপাতদৃষ্টিতে যৌক্তিক কিছু উপস্থাপন করলেই তা তারা গিলে ফেলবে। এর কারণ হলো, তারা

তো বিষয়টিকে দ্বীনী ইলমের আলোকে যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষমতা রাখে না - এ সম্পর্কিত পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব হেতু। এভাবেই মূলত বাতিল ধারণা মুসলমানদের মধ্যে বিস্তার লাভ করে।

সুতরাং আমাদের সম্মুখে এ দু'টি রাস্তা খোলা আছে: প্রথমটি হলো বর্তমান দ্বীনি অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের 'আলোকিত মাশরুমদের' কর্তৃক আবিষ্কৃত নতুন পথ। আর অপরটি হলো প্রমাণিত রাস্তা যার গোড়াপত্তন হয়েছে ঐসব মহাত্মন ব্যক্তিদের দ্বারা যারা ছিলেন জ্ঞানের মহাসমুদ্র ও তাক্বওয়ার পর্বত। মুক্বাল্লিদীন হলেন আসলাফের (সাধক পূর্বসুরীদের) অনুসারী। সুতরাং তারাই সত্যিকার 'সালাফি'। গায়র মুক্বাল্লিদীন বিশৃঙ্খল দলটি তাদের নিজস্ব মনগড়া রাস্তার পথিক। রাস্তার প্রতিটি মোড়ে তারা আসলাফের বিরোধিতা করেছে। সর্বাধিক প্রতারণামূলক পদ্ধতিতে তারা 'সালাফী' ধারণাকে ছিনতাই করেছে। কী অদ্ভূত এ পৃথিবী!

'নুসূস' [কুরআন ও হাদিস] অনুধাবনে পার্থক্য[৩]

কুরআন ও হাদিস সঠিকভাবে অনুধাবন প্রত্যেক ডাক্তার, প্রফেসর কিংবা কবি ও কৃষকের কাজ নয়! এটা একটি সুগভীর ও সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে কোনো বাইপাস নেই। আর অতীতের আইম্মাদের অনুসরণ না করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ইতা'আফ [আনুগত্য] এর দাবি কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। এখানে একটি উদাহরণ তুলে ধরছি।

ইক্বামাতের পদ্ধতির ক্ষেত্রে পার্থক্য

একটি হাদিসে আছে: "হযরত বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে দু' দু'বার [জোড়া সংখ্যায়] করে আযান এবং ইক্বামাত এক এক [বিজোড় সংখ্যায়] করে দিতে বলা হলো।"

[৩] নুসূস অর্থ কুরআন ও হাদিস।

ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হলো, ইক্বামাতের শব্দগুলো একবার করে, কিন্তু 'ক্বাদ ক্বামাতিস সালাহ' বলতে হবে দু'বার [তবে তাকবীর দু'বার হবে]।

অপরদিকে ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে, 'কাদ ক্বামাতিস সালাহ'-ও একবার মাত্র বলতে হবে।

ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হাদিসের অর্থ হলো প্রতিটি শব্দ-জোড়া একেকটি শ্বাসে উচ্চারণ করতে হবে। এর পক্ষে অতিরিক্ত দলিল হলো [আবু দাউদে উল্লেখিত] এই রিওয়ায়েতটি: "হযরত আবু মাহজুরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু, যিনি মসজিদে নববীর মুয়াজ্জিন ছিলেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন ১৭টি বাক্যে ইক্বামত দিতে।"

সুতরাং হানাফিরা উপরোক্ত উভয় হাদিসের ওপরই আমল করেন। অন্যদিকে অপর দু'জন ইমামের অনুসারীরা যেভাবে ইক্বামাত দেন তারা প্রথম হাদিসের ওপরই পূর্ণাঙ্গ আমল করছেন না- কারণ তারা 'তাক্ববির' ও 'ক্বাদ ক্বামাতিস সালাহ' দু'বার করে বলেন।

এভাবেই 'নাসের' [কুরআন ও হাদিস] বুঝার ক্ষেত্রে পার্থক্য এসেছে। কোনো ইমাম পরিচ্ছেদের সর্বাধিক সহীহ হাদিস তথা 'আসাহ্হু মা ফিল বাব' এর ওপর আমল করেছেন। ইমাম আবু হানিফার পদ্ধতি ছিলো ভিন্ন হাদিসের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন ও সবগুলোর ওপর আমল করা তথা 'তাতবিক্ব ও জামা'।

গায়র মুক্বাল্লিদীনের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য

সুতরাং গায়র মুক্বাল্লিদীনের সঙ্গে আমাদের একটি বড়ো পার্থক্য হলো তারা হুজ্জাত (প্রমাণ) হিসাবে উম্মাতের ইজমা (মতৈক্য) মানে না। তারা তাদের গায়র মুক্বাল্লিদ উলামার কট্টর মুক্বাল্লিদ! তাক্বলিদের বিরুদ্ধে তাদের সব হৈচৈ ও চিল্লাচিল্লি থাকাসত্ত্বেও তারাই আবার সর্বাধিক কট্টর মুক্বাল্লিদের ভূমিকায় আছে! সুতরাং সব এস্তব্যস্ততা মুসলমানদের মধ্যে

বিভ্রান্তি ছড়ানোর পরিকল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এরই মাধ্যমে তাদেরকে সঠিক আমলী জিন্দেগী থেকে বঞ্চিত করা।

তাক্বলিদের বিকল্প নেই

শুনুন! দ্বীন ও দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাক্বলিদের (অনুসরণের) বিকল্প নেই। আপনি একে যাই বলুন, প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজের পরিমণ্ডলে একেকজন মুক্বাল্লিদ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে- কার তাক্বলিদ? সুতরাং দ্বীনের ক্ষেত্রে হয় আপনি প্রধান দল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকার সালাফি বা মাজহাব অনুসরণ করবেন, না হয় ওসব আত্মস্বীকৃত স্কোলারদের অনুসরণ করবেন যারা সাহাবায়ে কিরামের আছার ও উম্মাতের ইজমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

আহলে হাদিস

একদল দাবি করে তারা 'আহলে কুরআন'। এ খেতাবটি মূলত প্রতারণামূলক। তারা কুরআনের লোক নয়। আমরাই হলাম কুরআনের লোক। তারা ঐ দল যারা হাদিস ও ইজমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, অথচ তারাই আবার দাবি করে 'আহলে কুরআন' হওয়ার।

অনুরূপ অবস্থা 'আহলে হাদিস' নামধারীদেরও। বাস্তবে আমরাই [মুক্বাল্লিদরা] হলাম হাদিসের অনুসারী। তারা দাবি করে কুরআন ও হাদিসকে মানে অথচ একই সময় প্রত্যাখ্যান করে সাহাবায়ে কিরামের আছার ও ইজমাকে। এটার অর্থ নয়, তারা হাদিসের অনুসারী আর আমরা ইমামদের অনুসারী ও হাদিসের নয়!

যান, ইসলামী পাঠাগারসমূহে যেয়ে দেখুন! ইমামগণ, তাঁদের উস্তাদ ও সাগরিদগণই বড়ো বড়ো হাদিসগ্রন্থের প্রণেতা। হাদিসের যে কোনো একটিও উল্লেখযোগ্য কিতাব গায়র মুক্বাল্লিদ কারোর কর্তৃক সংকলিত হয়েছে বলে প্রমাণ নিয়ে আসুন! আজকের উম্মাতের পূর্বে হাদিসের পূর্ণাঙ্গ ভাণ্ডার সংকলন ও প্রণয়ন করেছেন মুক্বাল্লিদ মুহাদ্দিসীনে কিরাম।

আজকের এসব তথাকথিত হাদিস বিশারদরা এসে হয় মহৎ ও বিজ্ঞ উলামায়ে কিরামের কাজের মধ্যে কুন্তিলতা করেছেন না হয় নিজেদের 'অবাঞ্ছিত' মতামতসম্বলিত নোট্স ও বাতিল এবং অপ্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা যুক্ত করেছেন।

গায়র মুক্বাল্লিদ / সালাফি / আহলে হাদিস ফিরকাসমূহ শুধুমাত্র কুরআন ও হাদিস গ্রহণ করেছে বলে দাবি করে। তারা সাহাবায়ে কিরামের ইজমা এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইজমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা এসব কথা সরাসরি বলে থাকে। কিন্তু তাদের 'মাজহাবের' প্রতি তাকিয়ে দেখুন- সবকিছু দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠবে।

বিভ্রান্ত আরেক ফিরকার নাম কাদিয়ানী। তাদের অবস্থাও মূলত অনুরূপ। তারা 'খতমে নবুওয়াত'-কে কখনো খোলাখুলিভাবে অস্বীকার করে না। তারা বলে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাতামুল আম্বিয়া- এরপরও তারা বলে, গোলাম আহমদও একজন রাসূল! সুতরাং তারা তাদের নিজস্ব 'খতমে নবুওয়াত ধারণা' সৃষ্টি করেছে। এখানেও নয় ওখানেও নয়- এরূপ অবস্থা! বর্ণিত অন্যান্যদের অবস্থাও অনুরূপ। আবারও তাদের কার্যাদির প্রতি লক্ষ করুন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত

আমরাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত। এটা মনে রাখবেন!

আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কিরামের পন্থাবলম্বন করি। অনুসরণ করি খুলাফায়ে রাশিদীনের পথকে। আর এরই বেষ্টনের মধ্যে সম্পৃক্ত আছে কুরআন ও হাদিস পূর্ণাঙ্গভাবে। এই রাস্তাটি আমাদের পর্যন্ত পৌঁছুয়ে দিয়েছেন আমাদের মহাত্মন ইমামগণ যারা ছিলেন ইলমে নবুওয়াতের অতন্দ্র প্রহরী ও সংরক্ষক।

আমরা অনুসরণ করি কুরআন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত এবং মু'মিনদের রাস্তা। যে আয়াতে করিম দ্বারা শুরু করেছিলাম সেটি পুনরায় উল্লেখ করে এ পর্বের সমাপ্তি টানছি।

"যে কেউ রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে সে দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব, আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান।" [সূরা নিসা : ১১৫]

হাদিস, ইজমা ও কিয়াসের দালায়িল

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

" ... এবং আপনার কাছে আমি স্মরণিকা অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে ঐসব বিষয় বিবৃত করেন, যেগুলো তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।" [সূরা নাহল : ৪৪]

হাদিস, ইজমা ও কিয়াসের হুজ্জিয়াতের [প্রমাণের] ওপর এ লেখা একটি রিসালা (পুস্তিকা)। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত তিনটিই দ্বীনের প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তবে অন্যান্য ফিরকা আছে যারা এর এক বা একাধিকটা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

সূরা নিসার ১১৫ নং আয়াতে হুজ্জাত হিসাবে কুরআন, হাদিস ও ইজমার কথা উল্লেখিত হয়েছে। উপরে উদ্ধৃত সূরা নাহলের ৪৪ নং আয়াতে হুজ্জাত হিসাবে হাদিস ও কিয়াসের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

দ্বীন একটি, শরীয়ত অনেক

মানবজাতির পথনির্দেশনার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বীন ও শরীয়তকে প্রেরণ করেছেন। এখানে দু'টি বিষয়: দ্বীন (ধর্ম) ও শরীয়ত (বিধানাবলী)।

হযরত আদম আলাইহিস্‌সালাম থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের দ্বীন এক ও অভিন্ন রয়েছে। এই দ্বীনের নাম ইসলাম। সকল আম্বিয়াকে কিরাম ইসলাম নিয়েই আবির্ভূত হয়েছেন। কিন্তু সময়ের প্রেক্ষিতে আম্বিয়াদের শরীয়ত ভিন্ন ছিলো। সুতরাং সকলেই একটি মাত্র দ্বীনসহ এসেছিলেন, কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে শরীয়তে রদবদল ঘটেছে।

বর্তমান উম্মতই একমাত্র মুসলমান

আল্লাহ তা'আলার ফজলে উম্মাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'মুসলিম' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। এটা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্‌সালামের দু'আর বরকতে হয়েছে (কুরআন, সূরা হাজ্জ)। 'মুসলিম' শব্দের অর্থ হচ্ছে, 'যে লোক আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে।'

হযরত মুসা আলাইহিস্‌সালাম ইয়াহুদীদের পক্ষে বললেন, "ইন্না হুদনা ইল্লাইক" [আমরা তোমার দিকে ফিরে আসলাম]। সুতরাং তারা 'ইয়াহুদ' নামে পরিচিত হলো। এর অর্থ 'যারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে'।

হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালাম তাঁর শাগরিদদের বললেন: "মান আনসারী ইলাল্লাহ" [আল্লাহর ওয়াস্তে কে আমাকে সাহায্য করবে?]। যারা সাড়া দিয়েছিলো তাদেরকে বলা হলো, তোমরা 'নাসারা' [সাহায্যকারী]।

উসূল [মূল] ও ফুরূ [শরীয়ত]

দ্বীন হচ্ছে 'আসাল' [উসূলের একবচন] - মৌলিক বিষয়-আসয় বা মূল।

শরীয়ত হলো এর ফারা' [ফুরূ এর একবচন] - 'আসাল' থেকেই 'শরীয়ত' উদ্ভূত।

দ্বীন ও শরীয়তে রিয়া'আয়াত (চিন্তা-বিবেচনা)

শরীয়তে কিছু পরিমাণ রিয়া'আয়াত আছে যা নির্ভর করে যুগ [যামান] ও অবস্থা [হাল] এর ওপর। কিন্তু দ্বীনের মধ্যে কোনো রিয়া'আয়াত নেই। আর এ কারণেই [যুগ যুগ ধরে] দ্বীনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। প্রারম্ভ থেকে দ্বীন একক হিসাবে রয়েছে। অপরদিকে আম্বিয়ায়ে কিরামের শরীয়ত একেক নবীর আবির্ভাবকালীন সময় ও আহওয়াল (যুগের পরিস্থিতি) মুতাবিক পরিবর্তিত হয়েছে।

কেনো?

দ্বীনের মূল বিষয় তিনটি: ১. তাওহিদ [আল্লাহর একত্ব], ২. রিসালাত [রাসূলের প্রতি বিশ্বাস] ও ৩. মা'আদ [আখিরাতে বিশ্বাস]। সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের দাওয়াতে এ তিনটি বিষয়ই মূখ্য ছিলো। এগুলোর মধ্যে কোনো ছাড় নেই। এমনকি এর আংশিক অস্বীকৃতির নাম হলো 'কুফর' [অবিশ্বাস]। এগুলো হচ্ছে আক্বাইদের [বিশ্বাসের] উসূল [মূল]।

শরীয়তে কিছু পার্থক্য ছিলো। আদম আলাইহিস্‌সালামের সময় সকল মানুষ তাঁরই সন্তানাদি ছিলেন। সুতরাং ঐ সময় নিজের বোনকে বিবাহ করা বৈধ ছিলো। কারণ পৃথিবীর জমিনে তো আর কোনো নারীই ছিলো না। এখন এই কাজটি হারাম। কোনো কোনো শরীয়তে তিনবার সালাত আদায় ছিলো ফরয। কিন্তু এখন ৫ বার আদায় করতে হয়। এটাই হচ্ছে রিয়া'আয়াত। এখানে এর ক'টি মাত্র উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

আহলে কুরআন

এবার আমরা ফিরে আসছি মূল বিষয়ে। আমাদেরকে বুঝতে হবে দ্বীন ও শরীয়তের উসূল এবং দালায়িল (মূলতত্ত্বাদি ও প্রমাণাদি)। ইসলামের মৌলিক সূত্র তিনটি: **কুরআন, হাদিস ও ইজমা।**

কুরআনে করীম হচ্ছে দ্বীন ও শরীয়তের আদি উৎস। কুরআন অস্বীকার করার নাম কুফর। কুরআন অস্বীকার করে কেউ মুসলমান হওয়ার দাবি করতে পারবে না।

প্রথমে যে ফিরকাটির ওপর আমরা আলোচনা করবো তারা নিজেদেরকে 'আহলে কুরআন' বলে সম্বোধন করে। তারা কুরআন ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করে না। তারা হাদিস প্রত্যাখ্যান করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এই দল সম্পর্কে অবগত করেছেন। সর্বপ্রথম এদের আবির্ভাব ঘটে ইসলামের ইতিহাসের প্রাথমিক যুগেই।

হযরত মিক্বদাদ ইবনে মা'দিকারিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "শুনো! আমাকে কুরআন ও এর মতো অন্যান্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। অচিরেই তোমরা দেখতে পাবে এক মেদী, ভাবনাহীন ব্যক্তি, যে গদিতে বসে বলবে, 'কুরআনে যাকিছু হালাল ও হারাম তা অনুসরণ করো।'" তিনি আবার বললেন, "শুনো! যা কিছু হালাল ও হারাম হিসাবে রাসূল ঘোষণা করেন, তা সবই যেনো স্বয়ং আল্লাহই ঘোষণা করেছেন!" [মিশকাত, হা.নং. ১৬৩]

হযরত ইরবাদ ইবনে সারিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "তোমাদের মধ্যে উদাসীন কোনো ব্যক্তি কি গদিতে হেলান দিয়ে বলবে না, আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন? শুনো! আল্লাহর কসম! আমাকে নির্দেশ করা হয়েছে, আমি উপদেশ দিয়েছি এবং কিছু জিনিস আমি হারাম করেছি। এগুলো কুরআনের মতো এবং সময় সময় আরোও অতিরিক্ত!" [মিশকাত, হা. নং ১৬৪]

এসব লোকের দাবী ভ্রান্ত - অসত্য। প্রথম শতকে সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈদের যুগেই এদের আবির্ভাব ঘটে। এদের অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান। পাকিস্তানে এদের সংখ্যা কয়েক হাজার হবে। তারা বলে, একমাত্র কুরআনই যথেষ্ট। তারা নিজেদেরকে 'আহলে কুরআন' বলে। এই নামটিও প্রতারণামূলক। পুরো উম্মাতই তো কুরআনকে মানে। এ দিক থেকে সমগ্র উম্মাতই হচ্ছেন 'আহলে কুরআন'। বাস্তবে এদের

সঠিক নাম হলো 'মুনকিরীনে হাদিস' - হাদিস প্রত্যাখ্যানকারী। সুতরাং আমাদেরকে হাদিসের হুজ্জাত প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

শিয়া - হাদিসের সর্বাধিক বড় প্রত্যাখ্যানকারী

এখানেই আসে শিয়ারা। সাধারণত আমরা তাদেরকে মুনকিরীনে হাদিস বলে বিবেচনা করি না। অথচ তারাই হচ্ছে তালিকার শীর্ষে। তারা সুন্নীদের সকল হাদিস প্রত্যাখ্যান করেছে। তাদের আছে নিজস্ব সৃষ্ট কিছু জাল হাদিস। তারা বিশ্বাস করে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে ইমামাত ও খিলাফাতের অধিকারী হয়েছিলেন হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু। এরপর যথাক্রমে তা স্থানান্তরিত হয় হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার নিকট। এভাবে ইমাম হন মোট ১২ জন। এসব ইমাম নাকি ওহী প্রাপ্ত হতেন। এসব ওহী কুরআনের সমপর্যায়ের! ইমামের ওহী এমনকি নবীর বাণীকেও রহিত করতে পারে! এসবই তাদের বিশ্বাস। তারা ইমামদের নবী বলে না ঠিকই, কিন্তু তাদেরকে তারা আম্বিয়ায়ে কিরামের সকল অধিকারিত্বে ভূষিত করেছে!

তাদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হাদিসগ্রন্থ হচ্ছে ইয়াকুব কুলাইনি সংকলিত 'আল-কাফি'। এ কিতাবের মাত্র ১০ শতাংশ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী। আর বাকি ৯০ শতাংশ হচ্ছে ইমামদের 'হাদিস'। এ হচ্ছে তাদের ক'টি মাত্র বিশ্বাসের ফিরিস্তি।

সুতরাং উক্ত দু'টি দল [আহলে কুরআন ও শিয়া] দ্বীনের হুজ্জাত [প্রমাণ] হিসাবে হাদিসকে মানে না। কিন্তু বাকি সকল উম্মাত তা মানেন। দ্বীনের উসূল ও অন্যান্য শরঈ নির্দেশ হাদিস থেকে যেমন প্রমাণিত তেমনি কুরআন থেকেও প্রমাণিত।

আহলে হাদিস ও ইজমার ইনকার [বিশ্বাসীদের মতৈক্য]

হাদিস পরে আমরা দ্বীনের হুজ্জাত হিসাবে ইজমাকে মানি। উপরে বর্ণিত হাদিস প্রত্যাখ্যানকারীদের মতো আরো একটি দল আছে যারা ইজমাকে

প্রত্যাখ্যান করেছে। এরা আবির্ভূত হয়েছে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালে। ভারতবর্ষ ও আবরদেশে বৃটিশ শাসনামলে এরা আত্মপ্রকাশ করে। তারা বৃটিশ সরকারের কাছে 'আহলে হাদিস' নামে নিজেদেরকে নিবন্ধিত করে। এভাবে তারা নিজেদেরকে 'আহলে কুরআন' দল থেকে আলাদা করেছিল।

আহলে হাদিসদের সঠিক নাম কি?

তাদের এ নামটি মূলত প্রতারণামূলক। অপর ফিরকাসমূহের মতো তারাও দ্বিতীয় স্তরে এসে আটকা পড়ে যায়। পরের স্তরে উন্নীত হতে পারে নি। আমার এদেরকে 'গায়র মুক্বাল্লিদ' বলে আখ্যায়িত করেছি। কিন্তু আশ্চর্য কথা হলো এ উভয় নামই এদের ক্ষেত্রে খাটে না। আমরা হলাম 'আসহাবুল হাদিস' - হাদিসের অনুসারী। আর তারা হলো গায়র মুক্বাল্লিদের একনিষ্ঠ সমর্থক। তারা আমাদের ইমামদের তাক্বলিদের কট্টর বিরোধিতা করে। অথচ তারাই আবার সম্পূর্ণ অন্ধ ও কট্টরভাবে নিজেদের ইমামদের সবকিছু সঠিক ও মিথ্যার ক্ষেত্রে অনুসরণ করে!

কেউ কেউ এদেরকে 'আহলে জাহির' বলেছেন। কারণ তাদের ইলম খুব অগভীর ও অস্বচ্ছ। এ নামটি তারা পছন্দ করে না। এ কারণে তারা কুফর সরকারের নিকট যেয়ে 'আহলে হাদিস' বলে নিজেদের নাম নিবন্ধিত করেছে। এরপর যখন বৃটিশ-সৌদি-আমেরিকান সরকার প্রতিষ্ঠা হলো, পেট্রোল-অর্থের লোভ খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠলো, তখন আহলে হাদিসরা 'নজদি ওয়াহাবীদের' সঙ্গে হাত মিলালো। তারা নিজেদেরকে এবার 'সালাফি' বলে প্রচার করতে লাগলো। সালাফি অর্থ আগের যুগের লোকদের অনুসারী। কিন্তু এ মানটি তাদের জন্য মোটেই যথাযথ নয়! কারণ এ দলের রাস্তা সালাফে সালিহীন থেকে বহু বহু দূরে।

আমরা এদেরকে গায়র মুক্বাল্লিদ বলতে পারি না এজন্য যে, তারা হচ্ছে সর্বাধিক কট্টর মুক্বাল্লিদ! আমরা সকল ইমামকে হাক্ব হিসাবে মানি। সময় সময় আমরা অপরের ফিক্হও গ্রহণ করি। কিন্তু তারা অন্ধ ও কট্টরভাবে তাদের [আধুনিক] ইমাম ও উলামার অনুসরণ করে। তারা অপর সবাইকে ভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করে।

আমরা রাশিদীন ইমামদেরকে অনুসরণ করি। তারা অনুসরণ করে তাদের নিজস্ব বিভ্রান্ত ইমামদের।[৪]

এদেরকে কী লা-মাজহাবী বলা যায়?

আরব হক্কানী উলামার নিকট এ দলটি হলো 'লা-মাজহাবিয়্যাহ'- অর্থাৎ যারা কোনো সঠিক মাজহাব অনুসরণ করে না। উর্দুতে এ নামটি ব্যবহৃত হতে পারে না। আরবিতে 'মাজহাব' মানে ফিক্হ [একটি বিশেষ দ্বীনি ফিক্হ]। উর্দুতে এর মানে হলো দ্বীন বা ধর্ম।

সুতরাং মাজহাবের উর্দু অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। কারণ এদেরকে অমুসলিম বলা যাবে না। তারা মুসলমান- কিন্তু হিদায়াতের জন্য কোনো ইমামের অনুসরণ করে না।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত

হাদিসে বলা হচ্ছে আমরা যেনো উম্মতের 'সাওয়াদ-ই-আজম' [বিরাট দল] এর অনুসরণ করি। আমরা এই পথে আছি। আমরা হলাম 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত'।

আমরা কুরআন অনুসরণ করি, এরপর অনুসরণ করি সুন্নাত- শুধু হাদিস নয়। এরপর আমরা অনুসরণ করি সাহাবায়ে কিরামের রাস্তাকে, মু'মিনীন ও তাদের ইজমাকে- এটাই জামাআত।

হাদিস ও সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য

চারটি বিষয় হাদিসের অন্তর্ভুক্ত:

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আক্বওয়াল [বাণী- কথা]।

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আফ'আল [আমল- কর্ম]।

---

[৪] যেমন: নাসিরুদ্দীন আলবানি, উসাইমিন ও বিন-বায।

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাক্বরীর[৫] [সম্মতি-অনুমতি]।

৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শারীরিক ও চারিত্রিক অভ্যেসসমূহ।

সুন্নাতের অর্থ

সুন্নাত অর্থ: আত-তারীক্বাতুল মাসলূকাহ ফীদ-দ্বীন - দ্বীনের অনুসৃত রাস্তা। হাদিস ও সুন্নাতের মধ্যে নিসবত (যোগসূত্র) হচ্ছে আম-খাস মিন ওয়াজহিন। অর্থাৎ, তারা অনুরূপ একদিকে [মুত্তাফিক্ব] আর দু'দিকে ভিন্ন [মুফতারিক্ব]।

মাদ্দাতুল ইফতিরাক্ব [পার্থক্য দু'টি]:

১. ওসব হাদিস যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাস। যেমন, একই সময় ৪ বারেরও বেশি বিয়ে করা। এগুলো হাদিস কিন্তু সুন্নাত নয়।

২. ওসব বিষয় যা চার খলিফা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এগুলো সুন্নাত, এমনকি এদের পক্ষে হাদিস না থাকলেও। যেমন, জুমু'আর নামাযের দ্বিতীয় আযান যা হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৬]

---

[৫]অর্থাৎ, নবীজীর সম্মুখে কিংবা আড়ালে থাকাবস্থায় কোনো সাহাবির আমল সম্পর্কে জেনেও তিনি এটির ওপর অভিযোগ কিংবা নিষেধ করেন নি।

[৬]ইদানিং সালাফিরা তারাবির নামায ২০ রাকাআত নয় বলে খুব চিল্লাচিল্লি শুরু করেছে। অথচ ২০ রাকাআত হওয়ার প্রমাণাদি রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদিস, উমর রা. এর সুন্নাত ও সাহাবায়ে কিরামের ইজমা থেকে সুস্পষ্ট। ইসলামের আবির্ভাবকাল থেকেই তারাবির নামায ২০ রাকাআত পড়ে আসছেন সকল মুসলমান।

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সুন্নাত

উপরোক্ত পদ্ধতিতে তিনটি মাসআলা হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলো হলো দু'দল মুসলমানের মধ্যে যুদ্ধের মাসআলা। যেমন:

১. (উভয় দলের) যারা মারা যাবে তারা জান্নাতী না জাহান্নামী?

২. পরাজিত দলের মালামাল গণিমত হিসাবে গ্রহণযোগ্য কি না?

৩. যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস হিসাবে গন্য করা যাবে কি না?

উক্ত তিনটি প্রশ্নের জবাবে হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু মাসআলা প্রতিষ্ঠা করেন। এগুলোও সুন্নাত হিসাবে মানতে হবে, যদিও এদের সমর্থনে কোনো হাদিস নেই।

জঙ্গে জামাল হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু সমর্থিত ও হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা সমর্থিত দু'টি দলের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর দল যুদ্ধে বিজয় লাভ করেন। যুদ্ধ শেষে উপরোক্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। কিছু মুসলমান চেয়েছিলেন যুদ্ধের মালামাল বণ্টন করে নিয়ে যেতে। কিন্তু আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন: "কোন্ হতভাগা আছে যে হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহাকে দাসী হিসেবে গ্রহণের সাহস করে? কোনো যুদ্ধলব্ধ মালামাল এখানে নেই, নেই কোনো দাস-দাসী!" সুতরাং সব যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত হরা হয় এবং সকল শহীদের মালামাল তাদের পরিবারবর্গের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

এরপর আসলো হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার মধ্যে সিফফীনের যুদ্ধ। কেউ কেউ যুদ্ধ শেষে প্রথম প্রশ্ন উত্থাপন করেন। হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু জবাব দিলেন: "আমাদের [শুহাদা] ও তাদের [শুহাদা] সকলে জান্নাতে চলে গেছেন।"

উপরোক্ত মাসআলাগুলোর সমাধান কারোর পক্ষেই সহজে বের করা সম্ভব ছিলো না। কারণ, উভয় ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো হাদিস মওজুদ নেই। এমনকি অনুরূপ কোনো

হাদিসও ছিলো না, যার ওপর ভিত্তি করে শরঈ কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছুনো যেতো [কিয়াস]।

দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞরা [সালাফি] জুমু'আর নামাযের দ্বিতীয় আযান ও তারাবী নামাযের রাকাআত সংখ্যা নিয়ে সাধারণত খুব বেশি চেঁচামেচি করে থাকে। আমরা উপরে হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সুন্নাহ উপস্থাপন করেছি, কারণ এ সম্পর্কে সঠিকভাবে বুঝার স্তরে তারা এখনো পৌঁছুয় নি! হয়তো এটা যখন তাদের বুঝে আসবে তখন আরেকটি মাসআলা নিয়ে চিল্লাচিল্লি শুরু করবে!

মূল কথাটি হলো, খুলাফায়ে রাশিদীন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ফাতওয়া ও আইনকানুন সুন্নাত হিসাবে মুসলমানরা গ্রহণ করেছেন। এমনকি এসব বিষয়ের ওপর সুস্পষ্ট কোনো হাদিস যদি না-ও থাকে- তারপরও এগুলো সুন্নাত। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অবস্থান সবসময় এটাই ছিলো। শুধু এ যুগে এসে উক্ত [সালাফি] দলটি এর বিরোধিতা করছে।

আমরা একটু পরই 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত' নামটির ওপর আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। এখনকার মতো এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, আমরা আহলে সুন্নাত, আহলে হাদিস নই।

হাদিস ও সুন্নাতের মধ্যে সাদৃশ্য [মাদ্দাতুল ইজতিমা']

যেসব হাদিস 'মা'মূল বিহা' (পালনীয় আমল) এবং মানসূখ (রহিত) কিংবা খাস (বিশেষ) নয়, তা সবই সুন্নাত।

এই শ্রেণিভুক্ত সকল হাদিস আমরা গ্রহণ করি এবং এর ওপর আমলও করি। আমরা আসহাবে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুমের সুন্নাতও অনুসরণ করি।

দু'টি কারণে 'আহলে হাদিস' হওয়া গ্রহণযোগ্য নয়

১. হাদিসের মধ্যে যুক্ত আছে মানসূখ (রহিত) ও খাস (বিশেষ) বর্ণনা। হাদিস হওয়া সত্ত্বেও এগুলোর ওপর আমল করা বৈধ নয়। যেমন: একই

সাথে চার বারের বেশি বিয়ে করা কিংবা সাময়িক বিয়ে- এ উভয়টি বাতিল।

২. খুলাফায়ে রাশিদীনের কিছু সুন্নাত হাদিসে নেই। এ কারণে সালাফিরা দ্বালালাতে (ভ্রান্তিতে) আছে। খুলাফাদের সুন্নাত অনুসরণ করতে হাদিসেই আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হয়েছে, ঠিক যেভাবে নির্দেশ করা হয়েছে পবিত্র কুরআনে সুন্নাত অনুসরণের জন্য।

'আহলে কুরআন' নামধারীরা সুন্নাত প্রত্যাখ্যান করেছে। 'আহলে হাদিস' [এবং সালাফি] নামধারীরাও আমলী জিন্দেগীতে তা প্রত্যাখ্যান করেছে- কিন্তু এ ব্যাপারে প্রশ্ন তুললে উভয় দলই [অর্থাৎ আহলে কুরআন ও আহলে হাদিস নামধারীরা] তার স্বীকৃতি দেয় না।

এ হচ্ছে গায়র মুক্বাল্লিদ, সালাফি ও আহলে হাদিস ফিরকাসমূহের প্রতারণা।

একটি চ্যালেঞ্জ

আমরা সকল আত্মসৃষ্ট 'আহলে হাদিস' নামধারীদের চ্যালেঞ্জ করছি, একটি মাত্র হাদিস উপস্থাপন করো যেখানে আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, 'হাদিস অনুসরণ করো!'। হাদিস একটি পরিভাষাগত শব্দ, একটি শিক্ষায়তনিক শ্রেণিভুক্তকরণ মাত্র।

হাদিসে আমাদেরকে নির্দেশ করা হয়েছে সুন্নাত অনুসরণের জন্য: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত সবাই অনুসরণ করে। আমাদেরকে এটাও হাদিসে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হয়েছে, খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতও অনুসরণ করতে। এ ব্যাপারে কোনো পার্থক্য নির্ধারণ করা হয় নি!

আমাদের আলোচনায় উক্ত বিষয়টিই 'সত্য' ও 'মিথ্যা'র মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করেছে। আমরা হাদিসের অনুসরণ করি- তারাও হাদিসের অনুসরণের দাবি করে- শুধু দাবি, কিসের দাবি?

ক) 'মিথ্যা' এবং

খ) প্রতারণা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "তোমাদেরকে অবশ্যই আমার সুন্নাত ও খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত অনুসরণ করতে হবে! তোমরা এতে শক্তভাবে অনড় থেকো এবং দাঁত দ্বারা কামড়ে ধরো!"

অপর আরেক হাদিসে তিনি বলেন: "যে কেউ দুর্যোগপূর্ণ সময়ে আমার সুন্নাতের ওপর অটল থাকবে ..."।

এবং

"আমি দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ এগুলোকে আকড়ে ধরবে ততক্ষণ তোমরা কখনও পথভ্রান্ত হবে না। এগুলো হলো কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহ।"

হাদিস মুখস্ত করা ও অপরদের নিকট পৌঁছুনোর মধ্যে বিরাট মাহাত্ম্য বিদ্যমান। কিন্তু আমাদেরকে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে সুন্নাত।

হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সুন্নাত

আমরা অন্যান্য খলিফার সুন্নাতের ওপর কিছুটা আলোচনা করেছি। প্রথম খলিফা সায়্যিদিনা আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহুও আমাদের জন্য কিছু সুন্নাত রেখে গেছেন। বাস্তবে প্রথম খলিফা হওয়ায় তিনিই সর্বপ্রথম কিছু সুন্নাতের প্রবর্তন করেন।

যদি কোনো শহরের বাসিন্দারা ইসলামের এক বা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ (যেমন, যাকাত) অমান্য করে, তাহলে আমীর তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করতে পারেন। একদল লোক যখন যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানালো তখন তিনি বললেন: "তারা যদি একটি সুতাও প্রদান করতে অস্বীকার করে যা তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় দিত, আমি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো!" হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু এ সিদ্ধান্তটি বুঝতে পারলেন না। তিনি ভাবলেন, ইসলাম ও মদীনার ওপর এরচেয়ে আরো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলী আপতিত

হয়েছে- যেমন, মুরতাদদের আবির্ভাব ও মদীনা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা।

কিন্তু উপরোক্ত সিদ্ধান্তটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। এর ওপর নির্ভর ছিলো মুসলিম জাতির ভবিষ্যৎ স্থিতিশীলতা। হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু মৃত্যুর পূর্বে একজন খলিফা উত্তরাধিকার [অর্থাৎ উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু] নিযুক্ত করলেন। এ ব্যাপারে একটি নির্দেশনামা লিখে হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে বললেন মুসলমানদেরকে মসজিদে একত্রিত করতে। সুতরাং সবাই হযরত উমরের হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন।

উক্ত দু'টি মাসাঈল শুধুমাত্র আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। কারণ এটা ছিলো সাহাবায়ে কিরামের যুগ। সবাই ছিলেন জ্ঞানী ও আনুগত্যশীল। এর পরের প্রজন্মের মধ্যে সৃষ্টি হয় বিশৃঙ্খলা। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই হযরত উসমান ও হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার খিলাফতকালে সাহাবী নয়- এমন কিছু লোক, বিরাট অরাজকতার সূত্রপাত ঘটায়। এরা খলিফার সিদ্ধান্তসমূহ মেনে নিতে রাজি ছিলো না।

একব্যক্তি হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে প্রশ্ন করলো: প্রথম দুই যুগে [আবু বকর ও উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার খিলাফতকালে] ঐক্য ও শান্তি বিরাজ করে। দ্বিতীয় দুই যুগে [উসমান ও আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার খিলাফতকালে] সৃষ্টি হয় অরাজকতা ও অশান্তি। এর কারণ কি? তিনি জবাব দিলেন: "এর কারণ হলো রাই'য়্যাতের [সাধারণ জনতার] মধ্যে পরিবর্তন হওয়া।" আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু নেতৃত্ব দেন উমর, আলী, উসমান, আবু উবায়দা প্রমুখ রাদ্বিআল্লাহু আনহুমের। পরের দু'জন খলিফার যুগে আত্মপ্রকাশ করে একদল [জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও আনুগত্যের দিক থেকে] অভাবপূর্ণ লোক।

‘আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত’ নাম

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “ইয়াহুদ ও নাসারা ৭১ ও ৭২ টি দলে বিভক্ত হয়েছিল ... আমার উম্মাত ৭৩টি দলে বিভক্ত হবে। এর একটি ছাড়া বাকি সবাই হবে জাহান্নামী।” জিজ্ঞেস করা হলো নাযাতপ্রাপ্ত দল কোন্‌টি? জবাব দিলেন, “মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবিহি” - যারা আমি ও আমার সাহাবার রাস্তা অনুসরণ করবে।

আমার রাস্তা: এর অর্থ সুন্নাত।

আমার সাহাবা: এর অর্থ আল-জামা’আ। এ থেকেই এসেছে ‘ইজমা’ [মু’মিনদের মতৈক্য]।

মিনহাজুস্‌ সুন্নাহ নামক কিতাবে ইবনে তাইমিয়্যাও এর সমর্থন করেছেন। আহলে হাদিস স্কলার, নবাব ওয়াহিদুজ্জামানও ‘নাজলুল আবরার’ কিতাবে এর পক্ষে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

হক্বপন্থী নাযাতপ্রাপ্ত দলটি হচ্ছে সেটি, যারা সুন্নাতের অনুসরণ করে এবং উম্মাতের ইজমাকে গ্রহণ করেছে।

দ্বীনের তিনটি উসূল [মূলসূত্র]

শরীয়তের মূলসূত্র তিনটি। এগুলো হলো: আল্লাহর কিতাব, সুন্নাত ও ইজমা।

চতুর্থ উসূল হচ্ছে ক্বিয়াস [যৌক্তিক বিশ্লেষণ] -এটা প্রথম তিনটি থেকে উদ্ভূত উসূল ও এদের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ মাসাদিরুল আসলিয়া [আসল মূলসূত্র] ৩টি। ক্বিয়াস হচ্ছে ৪র্থ টি- এর স্তর প্রথম তিনটির নিচে।

ক্বিয়াস হচ্ছে শরীয়তের মুযহির [লুকানো জিনিসকে উন্মুক্ত করে]- শরীয়তের মুতবিত [স্বয়ং দলিল] নয়। ক্বিয়াস হলো কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা থেকে আহরিত শরীয়তের আইন-কানুন সঠিকভাবে অনুধাবনের উপায়-অবলম্বন। মূল তিনটি সূত্রের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোনো আইন তৈরিতে ক্বিয়াসের ব্যবহার হয় না। মোটকথা ক্বিয়াস কখনো তিন মূলসূত্রের বিরোধী নয়।

কুরআন, হাদিস, ইজমা ও ক্বিয়াস পরস্পর-গ্রথিত

দ্বীনের চারটি উসূল সম্পর্কে বললাম। এর প্রথম তিনটির স্তর ঊর্ধ্বে। আর ক্বিয়াসের স্তর নিচে। কিন্তু চারটিই একে অন্যের সঙ্গে পরস্পর-গ্রথিত। দ্বীন হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ হচ্ছেন শা'রী [যিনি শরীয়ত প্রেরণ করেছেন]। এই শরীয়ত প্রতীয়মান হয়েছে উক্ত উসূলগুলোর মাধ্যমে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নির্দেশসমূহকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে আমাদের কাছে পৌঁছুয়েছেন ও আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি কোনোভাবেই এগুলোর মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করেন নি- কিংবা নিজের থেকে কিছু উপস্থাপন করেন নি [নাউযুবিল্লাহ]। এরপর সাহাবায়ে কিরাম সবকিছু আমাদের কাছে পৌঁছুয়েছেন।

তাঁদের [অর্থাৎ সাহাবাদের] 'ইজমা' ইসলামের ভিতকে শক্ত করেছে এবং এটা পরিবর্তন হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছে। তাঁরা নিজেরাও কোনো কিছু পরিবর্তন করেন নি। এভাবেই আমাদের দ্বীন 'শক্ত', 'জলরোধক', 'পরিবর্তন-রোধক' ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরপর আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ইজতিহাদ ও ক্বিয়াসের মাধ্যমে একে পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ গ্রন্থিত করেছেন। তাঁরাও দ্বীনে কোনো পরিবর্তন আনেন নি কিংবা নিজেদের কোনো কিছু সংযুক্ত করেন নি। এভাবেই সবকিছু পূর্ণতা লাভ করেছে।

শিয়ারা দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করেছে। খারিজীরা পরিবর্তনের চেষ্টা করেছে। মু'তাযিলীরাও চেষ্টা চালিয়েছে।

অনেক দল-ফিরকা এসেছে ও চলে গেছে। 'কুল্লুহুম ফীন্না-র!' -সকলেই জাহান্নামী হয়েছে। তারা আমাদের দলের অংশভুক্ত নয়।

এরপর অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে 'আহলে কুরআন', 'আহলে হাদিস', 'গায়র মুক্বাল্লিদ', 'সালাফি', 'মওদুদী' ইত্যাদি ফিরকা-দলের আবির্ভাব ঘটেছে। তারা অনেককিছু পরিবর্তনের চেষ্টা করেছে ও করছে। তারা সৃষ্টি করেছে বিভ্রান্তি। এদের কোনো কোনোটি বেশিদূর অগ্রসর হয়েছে।

এরপর চলে গেলো ইসলামের গণ্ডির বাইরে। অন্যদেরকে 'মুসলমান' হিসাবেই মানা হবে। কিন্তু এরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিছু দল কোনো বিষয়ের ওপর কট্টর- অপররা অপরগুলোর ওপর। কিন্তু এ সবই দ্বালালাত [গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতা] এবং বিশৃঙ্খলা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমাদের সম্মুখে আছে সরল ও সুস্পষ্ট একটি রাস্তা। দ্বীন আমাদের পর্যন্ত পৌঁছুয়েছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের মাধ্যমে। পৌছুয়েছে প্রত্যেক যুগের সর্বোত্তম ব্যক্তিদের মাধ্যমে। আল্লাহ তা'আলা যেনো আমাদেরকে এর ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন ও এর ওপর উত্থিত করেন।

সকল হাদিস কুরআনের সঙ্গে সংযুক্ত

একদা এক বক্তৃতাকালে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু একটি হাদিস বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করলেন ঐ মহিলার প্রতি যে তার নিজের চুলের সঙ্গে অন্য চুল যুক্ত করে এবং ঐ ব্যক্তির প্রতি যে এরূপ কাজে জড়িত আছে। তিনি ঐ উল্কি অঙ্কনকারী ও যে অঙ্গের মধ্যে উল্কি অঙ্কন করায় তাদের প্রতিও অভিসম্পাত করলেন ...।

বয়ান শেষে একজন মহিলা এসে তাঁকে বললেন, "আপনি এমন কিছু বিষয়ের ওপর হাদিস বর্ণনা করলেন যার কোনো কিছুই কুরআনে নেই।"

তিনি মহিলাকে অবগত করলেন: "আপনি যদি কুরআন তিলাওয়াত করে থাকেন তাহলে নিশ্চয় আপনি এই আয়াতটি দেখেছেন:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

'রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক।' [সূরা হাশর : ৭]।"

ইজমাও কুরআন ও হাদিসের সঙ্গে যুক্ত

ইজমা হতে হবে মুসতানাদ [কুরআন ও হাদিসের কোনো কিছুর ওপর ভিত্তিশীল]। তাহলে প্রশ্ন জাগতে পারে, কুরআন ও হাদিস যেখানে বিদ্যমান সেখানে ইজমার প্রয়োজন থাকে কেনো?

এর জবাব হলো কোনো কোনো বিষয়ের ওপর কুরআন ও হাদীসে শুধুমাত্র ইশারা পাওয়া যায়। তখন ইজমা এসে একে স্পষ্ট করে। ইজমা হলো দ্বীনের 'হুজ্জাতে ক্বা'তী' [দ্বীনের সুস্পষ্ট দলিল]।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো নেতৃত্বের উত্তরসূরী নির্বাচিত করেন নি। তাঁর শেষ দিনগুলোতে হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে ইমাম নিযুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তিনি ১৪ দিন পর্যন্ত ইমামতি করেছিলেন। হযরতের ইন্তিকালের পর আনসারগণ সক্বিফা বনী শা'ঈদায় একত্রিত হলেন। তাঁরা দু'জন আমীরের প্রস্তাব দেন। এদের একজন ছিলেন মুহাজির ও অপরজন আনসার। কিন্তু হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রস্তাব দিলেন, হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমাম হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। সুতরাং তিনিই আমীর হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি। সকল সাহাবায়ে কিরাম এই প্রস্তাব মেনে নিয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাতে আনুগত্যের বাইআত গ্রহণ করলেন। এটাই ছিলো এই উম্মতের প্রথম ইজমা।

হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে ইমাম নিযুক্তকরণ ছিলো একটি ইশারা। অপরদিকে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু কর্তৃক এই ইশারাকে অনুধাবন ও সিদ্ধান্তগ্রহণ ছিলো ইজতিদলাল বা ক্বিয়াস। আর সাহাবায়ে কিরামের পূর্ণাঙ্গ সমর্থন ও মেনে নেওয়া ছিলো ইজমা।

ইজমা হচ্ছে হুজ্জাতে ক্বা'তী। একটি পরিপূর্ণ দলিল। এর বিরোধিতা হচ্ছে 'দ্বালালাত' [পথভ্রষ্টতা]। কেউ যদি [যে কোনো যুগে] হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকে অস্বীকার করে তাহলে সে ভ্রান্তিতে আছে। অনুরূপ আরেক ব্যাপার হচ্ছে ২০ রাকাআত তারাবী নামাযের নিয়ম।

তিন উসূলের সঙ্গে ক্বিয়াসের সংযুক্তি কিভাবে হলো

ক্বিয়াসের উদাহরণ হিসাবে ৩টি বড়ো পাত্রভর্তি উত্তপ্ত খাদ্য নিয়ে ভাবতে পারি। পাত্র থেকে খাদ্য বের করা খালি হাতে সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন চামচের।

অনুরূপ আমাদের সম্মুখে আছে কুরআন, হাদিস ও ইজমা। দ্বীনের মাসাঈল বের করতে ইমামরা ক্বিয়াস ব্যবহার করেন। আপনি একে ক্বিয়াস না বলে ইজতিহাদ বলতে পারেন। এতে কোনো পার্থক্য নেই। ইমামদের ক্বিয়াস মোটেই ব্যক্তিগত মতামত কিংবা দ্বীন নিয়ে যৌক্তিকতা নয়, যা আহলে হাদিসপন্থীরা দাবি করে থাকে। ইমামরা আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা ছিলেন এরূপ মন্দ কার্যকলাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

সুতরাং, আমরা দ্বীনের চারটি উসূলের প্রমাণাদি উপস্থাপন করলাম। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মাজহাব [পদ্ধতি, ফিক্‌হ] এই চারটির ওপর ভিত্তিশীল।

আমরা যে দু'টি আয়াতের মাধ্যমে শুরু করেছিলাম এগুলোর উদ্ধৃতি দিয়েই শেষ করছি।

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

"যে কেউ রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে সে দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান।" [সূরা নিসা : ১১৫]

"আপনার কাছে আমি স্মরণিকা অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে ঐসব বিষয় বিবৃত করেন, যেগুলো তোদের প্রতি

নাযিল করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।” [সূরা নাহল : ৪৪]

সূরা নহলের আয়াতের মাধ্যমে ক্বিয়াসের প্রমাণ

মক্কার কাফিররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করেছে। তারা যুক্তি দিয়েছে, আল্লাহ যদি সত্যিকার অর্থে কোনো সংবাদ প্রেরণ করার ইচ্ছা করে থাকেন, তাহলে তিনি কোনো ফিরিশতা কিংবা অন্য কোনো অতিস্বাভাবিক প্রাণির মাধ্যমে তা প্রেরণ করতেন।

ইতিহাসব্যাপী আল্লাহ তা’আলা নবী-রাসূলদের প্রেরণ করেছেন। সকলেই ছিলেন মানুষ। কোনো নবী বা রাসূল নারী ছিলেন না কিংবা এ কাজের জন্য কোনো ফিরিশতাকেও দায়িত্ব দেন নি।

কুরআন হচ্ছে মানবজাতির প্রতি আল্লাহর বার্তা। আল্লাহ যাচ্ছেতাই করার ক্ষমতা রাখেন। অথচ, আল্লাহ তা’আলা তাঁর অসীম জ্ঞান-প্রজ্ঞায় নিজের সৃষ্ট মানুষের মিজাজকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। এ কারণেই আল্লাহ তা’আলা কুরআনকে সরাসরি অবতরণ করেন নি। তিনি তাঁর নির্বাচিত রাসূলের মাধ্যমে তা পাঠিয়েছেন, যাতেকরে রাসূল সবাইকে তা বুঝিয়ে দেন। তাঁরই মাধ্যমে সবাই সঠিক পথপ্রাপ্ত হবে ও তিনি হবেন তাঁদের সহযোগী। আর সকলে নবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে সক্ষম হবে, কারণ তিনি তাদেরই মতো একজন মানুষ।

সাধারণ মানুষ ফিরিশতা কিংবা অতিস্বাভাবিক প্রাণিদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনে অপারগ। আল্লাহ তা’আলা মানুষের দুর্বলতাকে বিবেচনা করে তাঁর পক্ষ থেকে নবী পাঠিয়েছেন। আর এই নবীর আমল ও নির্দেশ হয়েছে কুরআনের নির্দেশনাবলীর ব্যাখ্যাস্বরূপ। এ সবই হাদিস।

সুতরাং উক্ত আয়াতের মাধ্যমে কুরআন ও হাদিসের হুজ্জিয়্যাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইজমা এখানে উল্লেখিত হয় নি। এটা উল্লেখিত হয়েছে অপর আয়াতে।

আল্লাহ তা’আলার ইরশাদ:

وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

‘ ... যাতে তারা চিন্তা করে’ -কথাটির অর্থ হলো, যাতে তারা কুরআনের গভীর মর্মার্থ নিয়ে ভাবে। সুতরাং এভাবে যখনই প্রয়োজন পড়বে তখনই তারা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে পথনির্দেশনা পাবে। খুলাফায়ে রাশিদীন তাঁদের স্ব-স্ব যুগে কুরআন ও হাদিস থেকে এরূপই পথনির্দেশনা খুঁজে বের করেছেন। এরপর প্রত্যেক যুগের ফুকাহায়ে কিরামও অনুরূপ কুরআন ও হাদিস থেকে পথনির্দেশনা খুঁজে বের করেছেন। যে কোনো মুহূর্তে নতুন মাসআলার প্রয়োজন পড়লেই উলামায়ে কিরাম সঠিক উত্তর বের করবেন, কুরআন ও সুন্নায় অনুসন্ধান করে।

আমরা প্রতিনিয়তই নতুন প্রশ্নের সম্মুখীন হই। সম্মুখীন হই প্রশ্নের ব্যবসা -বাণিজ্য ক্ষেত্রে, চিকিৎসা ক্ষেত্রে ইত্যাদি। তথ্য-প্রযুক্তি যতোই অগ্রসর হচ্ছে মুসলমানদের জন্য নিয়ে আসছে নতুন নতুন অবস্থার। এসব অবস্থার মধ্যে হিদায়াতের পথ হলো দ্বীনের সঠিক পন্থাবলম্বন। উলামায়ে কিরাম পথনির্দেশনা করবেন। এসব ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কিরামের কাজ হলো সঠিক গবেষণা ও ক্বিয়াস। এর বিকল্প কিছু নেই।

এখানে এসে আমরা বিরাট একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছি- ইজতিহাদ ও ক্বিয়াসের যোগ্যতা কার আছে? প্রত্যেক সাধারণ ব্যক্তি তো এ ব্যাপারে মতামত পেশ করার যোগ্যতা রাখেন না। এরূপ করার নাম ‘নাফসানি মতামত’। দ্বীনে একে হারাম করা হয়েছে। আর এটার ওপর আলোচনা একটি একক বিষয়।

উক্ত আয়াতের শেষের অংশ হলো ক্বিয়াসের প্রমাণ। ক্বিয়াস উপেক্ষা কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের এই শেষের যুগের ‘গায়র মুক্বাল্লিদরা’ ক্বিয়াস শব্দের প্রতি ভীষণভাবে এলার্জিপ্রবণ! কিন্তু বাস্তবে ঠিক ‘তাক্বলিদ’ এর মতো ক্বিয়াসের সর্বাধিক সমর্থক ও অনুসরণকারী মূলত তারাই! তারা হয়ে গেছে মুক্তচিন্তাবিদ! ক্বিয়াসের উসূল অধ্যয়ন ও অনুসরণ ছেড়ে তারা এ নিয়ে যাচ্ছেতাই করে যাচ্ছে। তারা বন্যাবাঁধ খুলে ফেলেছে। আলিম, অপরিপক্ক এমনকি অজ্ঞরাও এখন নিজেদের

ইচ্ছেমাফিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ পেয়ে গেছে! তারা আবিষ্কার করে যাচ্ছে অতি অদ্ভূত ধরনের অনেক ইস্তিম্বাত (সিদ্ধান্তগ্রহণ) ও ক্বিয়াস।

সুতরাং আজকের যুগে সর্বাধিক বিপদমুক্ত রাস্তা হচ্ছে আগের যুগের আল্লাহওয়ালা আইম্মাদেরকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা। দ্বীনে প্রত্যেকটি নতুন বিষয় বিপদসঙ্কুল ও বিভ্রান্তিকর। আল্লাহ যেনো এই সর্বাধিক ফিতনার যুগে আমাদেরকে রক্ষা করেন।

ভ্রান্তির এক বিরাট সূত্র হলো ভ্রান্তদের তাক্বলিদ

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে পুরাতন, এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কাননকুঞ্জ যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হল মহান কৃতকার্যতা।” [সূরা তাওবাহ : ১০০]

সম্মানিত মেজবানগণ আমার জন্য যে বিষয় রেখেছেন তার শিরোনাম হলো, “ভ্রান্তির এক বিরাট কারণ: তাক্বলিদ প্রত্যাখ্যান।”

আমি এই শিরোনামটি পরিবর্তন করে বলছি, “ভ্রান্তির এক বিরাট কারণ: ভ্রান্তদের তাক্বলিদ”। এ পৃথিবীর জমিনে প্রত্যেক ব্যক্তি একেকজন মুক্বাল্লিদ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে- তথা দ্বীন ও দুনিয়ায় তাক্বলিদের বিকল্প নেই। সকলেই মুক্বাল্লিদ। তাক্বলিদের তথাকথিত বিরোধীরাই হচ্ছে সর্বাধিক কট্টর ও অন্ধতম মুক্বাল্লিদ! সুতরাং পরিবর্তিত শিরোনামই

হচ্ছে অধিক যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত। প্রশ্ন ‘তাক্বলিদ’ নয় বরং ‘কার তাক্বলিদ’?

সঠিক অর্থ

‘তাক্বলিদ’ শব্দটির মূল হলো তাফ’ঈল বাব থেকে উদ্ভূত ‘ক্বাল্লাদা’। এর অর্থ হলো, কারে গলে নেকলেস [হার] পরানো। ফিকহের কিতাবে আপনি ‘ক্বাল্লাদাল ক্বাদ্বি’ শিরোনামে পরিচ্ছেদ পাবেন। এর অর্থ ‘একজন বিচারকের গলে চেইন পরানো’। অর্থাৎ, কোনো বিচারককে এভাবে নিযুক্ত করা।

আর এখানে এর অর্থ দাঁড়াবে, ‘দ্বীন পালনে কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির উপর কারোর ভরসা রাখা’।

একই মূল যদি ‘বাবুত্তাফাউ’ল’ [তাক্বাল্লুদ] এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তাহলে এর অর্থ হবে, ‘কারো গলে রজ্জু পরানো’। আর মানুষকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে এ অর্থটিই ওরা প্রচার করে থাকে। মোটকথা তাক্বলিদ ও তাক্বাল্লুদ শব্দদ্বয়ের মূল এক ও অভিন্ন কিন্তু তাদের অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন [আরবি ভাষার পণ্ডিতগণ এ ব্যাপারটি খুব ভালো ভাবেই জানেন। আরবিতে একই মূল থেকে অনেক ভিন্নার্থক শব্দ তৈরি হয়ে থাকে।]।

তাক্বলিদের জন্য দু’টি জিনিস জরুরী:

১. আস্থা [আক্বীদাত]।

২. ব্যক্তির অনুসরণ [ইত্তিবা’]।

আমাদের ক্ষেত্রে এর অর্থ হবে, ‘কোনো ইমামের ওপর আস্থা রাখা ও তাঁর বিবৃত রাস্তার অনুসরণ করা।’ তাঁরা ছিলেন তাক্বওয়াওয়ালা ইমাম। আস্থা ও অনুসরণের কারণ এটাই। সুতরাং আমরা তাঁদের কর্তৃক ব্যাখ্যাত দ্বীনকে গ্রহণ করেছি ও এ ব্যাখ্যানুযায়ী দ্বীনের আমল করি [কারণ, এরচেয়েও উত্তম বা এমনকি সমপর্যায়ের ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা আমাদের নেই]।

‘তাক্বলিদ’ ও ‘ইত্তিবা’ এক ও অভিন্ন

তাক্বলিদের বাস্তবতা বুঝতে পারলে সকল বিভ্রান্তির অবসান হবে। এই উন্মাদনার সঙ্গে সম্পৃক্তরা ‘তাক্বলিদ’ শব্দের প্রতি এলার্জিক। তাদের প্রতি আমাদের কথা হলো: ‘তাক্বলিদ এবং ইত্তিবা এক ও অভিন্ন’। এর অর্থ অনুসরণ করা এবং মানা।

সময়ের আবর্তে পরিভাষায় পরিবর্তন আসতে পারে। কিন্তু পরিভাষার পরিবর্তন হেতু বাস্তবতায় পরিবর্তন আসবে না।

শুধুমাত্র পরিভাষায় পরিবর্তন: ‘তাসাওউফ’, ‘জুহদ’ এবং ‘ইহসান’

তাসাওউফ [সুফিতত্ত্ব] হচ্ছে একটি প্রায়োগিক [টেকনিক্যাল] ধারণা। এটা ৫ম শতকে আত্মপ্রকাশ করে। এর পূর্ব পর্যন্ত একে ‘জুহদ’ [সংযম] বলা হতো। হাদিসে আপনি ‘ইহসান’ শব্দের ব্যবহার দেখবেন। এটা একই জিনিস। আর কুরআনে আপনি ‘মুহসিন’ শব্দ পাবেন।

হাদীসে জিব্রাঈলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো: “ইহসান কি?” তিনি জবাব দিলেন: “আপনি ওভাবে আল্লাহর উপাসনা করবেন যেমন আপনি তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন।”

ইহসান হচ্ছে ইসলামের আত্মা। আর ইহসানের বিজ্ঞানকেই বলে তাসাওউফ। শব্দগুলো ভিন্ন কিন্তু তাদের বাস্তবতা এক ও অভিন্ন।

হাদিস শাস্ত্রের সংকলনের যুগ ছিলো ২৫০ থেকে ৩০০ হিজরি পর্যন্ত।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইন্তিকাল করেন ২৪১ হিজরিতে।

ইমাম দারামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইন্তিকাল করেন ২৫৫ হিজরিতে।

ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইন্তিকাল করেন ২৫৬ হিজরিতে।

ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইন্তিকাল করেন ২৬১ হিজরিতে।

ইমাম ইবনে মাজাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইন্তিকাল করেন ২৭৩ হিজরিতে।

ইমাম আবু দাউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইন্তিকাল করেন ২৭৫ হিজরিতে।

ইমাম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইন্তিকাল করেন ২৭৯ হিজরিতে।

ইমাম নাসাঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইন্তিকাল করেন ৩২১ হিজরিতে।

এরাই ছিলেন মহাত্মন মুহাদ্দিসীনে কিরামের মধ্যে ক'জন। সবাই ছিলেন 'মুহসিন'। তাঁদের যুগে 'ইহসান' শব্দটি 'জুহদ' শব্দে পরিণত হয়। আপনি ঐ যুগের অধিকাংশ কিতাবে 'কিতাবুয জুহদ' শিরোনামে পরিচ্ছেদ পাবেন। সুতরাং সে যুগে সবাই ছিলেন 'জাহিদ'। এ যুগে আপনি বলতে পারেন 'সুফি'।

ইসলামী ৫ম শতকে সময় ও চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন হেতু মানুষ পার্থিব আকর্ষণের প্রতি বেশি বেশি ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু যাঁরা ছিলেন আহলুল্লাহ তাঁরা দুনিয়াবিমূখতা অবলম্বন করে জাহিদ হিসেবে জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হন। এদেরকে মানুষ ক্রমান্বয়ে 'সুফি' বলে সম্বোধন করতে থাকে। সুফি শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে ইখতিলাফ আছে। তবে অধিকাংশের মতে জাহিদরা যে পশমী জামা পরতেন তা থেকেই এটি উদ্ভূত হয়েছে। সুতরাং আমরা 'তাসাওউফ' ও 'সুফিতত্ত্ব' নামের ব্যবহার দেখতে পাই।

কুরআন ও হাদিসে আপনি 'ইত্তিবা' শব্দের প্রয়োগ দেখতে পাবেন। ইত্তিবা' শব্দের অর্থ অনুসরণ করা। আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও সাহাবায়ে কিরামের অনুসরণের নাম ইত্তিবা'। পরবর্তীতে 'তাক্বলিদ' শব্দের ব্যবহার শুরু হয়। তাক্বলিদ ও ইত্তিবা'র অর্থ একই।

কিছু লোক প্রশ্ন করে: "তাসাওউফ ও তাক্বলিদ কুরআন ও হাদিসে আছে কি?' কারণ এ শব্দটা নাসের[৭] কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নি।

[৭]অর্থাৎ, কুরআন ও হাদিসের মধ্যে।

এর জবাব হলো এগুলো পরিভাষা, যাদের উৎপত্তি হয়েছে পরের যুগে। ঠিক যেরূপ শরীয়তের অনেক পারিভাষিক শব্দ যেমন, 'ফরয', 'ওয়াজিব', 'সুন্নাত', 'সুন্নাতে মুয়াক্কাদা' এবং 'সুন্নাতে গায়র মুয়াক্কাদা', 'নফল', 'মুস্তাহাব', 'মাকরুহ', 'মাকরুহে তাহরিমী', 'মাকরুহে তানযীহ' ইত্যাদি যা হাদিসে নেই, অথচ এগুলো কেউ প্রত্যাখ্যান করেন নি। অনুরূপ হাদিসের স্তরবিন্যাস করতে যেয়ে ব্যবহৃত হয় 'সহীহ', 'দ্বায়িফ', 'হাসান' ইত্যাদি শব্দাবলি। সবাই এগুলো মেনে নিয়েছেন, যদিও কোনো এক বা একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক এসব শব্দ 'আবিষ্কৃত' হয়েছে।

হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা গ্রন্থে শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাসাওউফ সম্পর্কে 'আবওয়াবুল ইহসান' পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

আজকের সালাফি-ওয়াহাবী সৌদিভিত্তিক ফিরকার ধারণা হলো, একমাত্র তারাই আহলে হাক্ব। পৃথিবীর বাকি সব মুসলমান সেকেন্ড ক্লাস। তারা নিজেদের ছাড়া বাকি সবকিছুর বিরোধী। ইদানিং আমাদের তাবলীগ জামাআতের বিরুদ্ধে তাদের প্রয়োজন পড়ে 'ফাতওয়ার'। তাবলীগকে কালিমা দিতে তারা অনেকদূর এগিয়েছে। তারা তাবলীগ জামাআত বিরোধী বিরাট বিরাট গ্রন্থ রচনা করেছে। এতে তারা অনেক অভিযোগ, অর্ধ-অভিযোগ এবং সরাসরি মিথ্যাবাদিতার প্রচার করে যাচ্ছে। সৌদিদের 'তাসাওউফ' শব্দের প্রতি এলার্জি সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং এ লোকগুলো তাদের 'প্রধান মুফতি'র [ইবনে বায] কাছে অভিযোগের ঝড় তুলেছে যাতে করে তিনি তাদের কাঙ্ক্ষিত 'ফাতওয়াটি' দেন।

একদা আমাদের কিছু আকাবিরে কিরাম শায়খ বাযের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁদের নিকট সকল অভিযোগ ও প্রশ্ন উপস্থাপন করেন। তাঁরা এগুলোর জবাব দেন। একটি প্রশ্ন ছিলো: "আপনারা মানুষের কাছ থেকে বাইআত গ্রহণ করেন?" মাওলানা মুহাম্মদ উমর সাহেব জবাব দিলেন: "শায়খ! আমরা মানুষের কাছ থেকে আহদ [চুক্তি] আদায় করি যে, তারা সুন্নাতের অনুসরণ করবে ও বিদআত থেকে বেঁচে থাকবে।"

শায়খ বায বললেন, "এটা তো খুব ভালো জিনিস!" তাসাওউফ তো মাওলানা উমর সাহেবের ভাষায় 'আহদ' (চুক্তি) ছাড়া আর কিছুই নয়!

মাওলানা বখতিয়ারী সাহেব প্রাথমিক অবস্থায় মওদুদীর সঙ্গে ছিলেন। মওদুদী বলতেন, তাসাওউফ হলো উম্মতের জন্য আফিম! পরবর্তীতে যখন মওদুদী তাঁর রাস্তায় চলে গেলেন, মাওলানা বখতিয়ারী সাহেব তাঁকে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু মানুষ [এদের বিরুদ্ধাচরণ হেতু] তাসাওউফ সম্পর্কে তখনও সন্দেহমুক্ত হয় নি। সুতরাং মাওলানা সাহেব প্রতিষ্ঠা করলেন, 'মা'হাদে ইহসানী'- বা ইহসান প্রতিষ্ঠান। যে লোকগুলো ইতোমধ্যে তাসাওউফকে ঘৃণা করতো তারাই তখন তাঁরই প্রতিষ্ঠিত 'খানক্বায়' জমায়েত হতে লাগলো।

তাক্বলিদের উযূব [ওয়াজিবসমূহ]

কুরআন ও হাদিসে আমাদেরকে সুনির্দিষ্টভাবে তাক্বলিদ বা ইত্তিবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এসব নির্দেশ দিবালোক থেকেও আরো উজ্জ্বল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে পুরাতন, এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে"। [তাওবাহ : ১০০]

'ইত্তিবা' শব্দটি এখানে স্পষ্ট। সবাই দেখতে পারেন।

মুহাজিরীন ও আনসারদের অনুসরণ কারা করেন?

একটি উদাহরণ এখানে প্রযোজ্য হবে: আমরা একটি রেলগাড়ির কথা ভাবতে পারি। এতে মোট ২৫টি বগি আছে। প্রথমটির সঙ্গে যুক্ত আছে ইঞ্জিন বগিটি। দ্বিতীয়টির সঙ্গে যুক্ত আছে প্রথম, তৃতীয়টির সঙ্গে

দ্বিতীয়টি ইত্যাদি। এভাবে পুরো ২৫টি বগিই একটা আরেকটার সঙ্গে যুক্ত হয়ে অবশেষে যুক্ত হয়েছে সামনের ইঞ্জিনের সঙ্গে।

আরেকটি উদাহরণ দেখুন: লোহার চেইন বা শিকল আলাদা কতকগুলো হুক বা আংটা দ্বারা একটা আরেকটার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সবগুলো একক আংটা একত্রে মিলেই শিকল। কিন্তু প্রত্যেক আংটা একই সময় সকল আংটার সঙ্গে যুক্ত নয়। আগেরটার সঙ্গে পরেরটা যুক্ত হয়ে হয়ে পুরো শিকল তৈরি হয়েছে।

এই উম্মতের দৃষ্টান্তও উক্ত রেলগাড়ি ও শিকলের মতোই। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখি নি। না আমাদের সাক্ষাৎ ঘটেছে আসহাবে কিরামের সঙ্গে। অথচ আমরা তাঁদের সঙ্গে পরস্পরায় যুক্ত। আমরা একটি দীর্ঘ শিকলের মাধ্যমে যুক্ত। আল্লাহ তা'আলা এই পূর্ণাঙ্গ শিকলের ওপর সন্তুষ্ট। কারণ এর যুক্ততা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কিরামের সঙ্গে।

আমরা এই শিকলের মাধ্যমে আসহাবে কিরাম রিদ্বওয়ানুল্লাহি তা'আলা আজমাঈনকে অনুসরণ করি। সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। এভাবে সরাসরি অনুসরণের দাবি মূলত ভ্রান্ত, অযৌক্তিক ও বিবাদসৃষ্টিকর।

ইসলাম উক্ত শিকলের ওপর ভিত্তিশীল। এটাকে আরবিতে 'সনদ' বলে। আপনি আকাশ থেকে পড়তে পারেন না! ক'টি মাত্র গ্রন্থ পাঠ করে উপস্থাপন করতে পারেন না চমৎকার একটি দর্শন! আর এরই মাধ্যমে আশা করতে পারেন না যে, উম্মতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার মতামতকে অনুসরণ করবে? হ্যাঁ, আপনি সহজ টার্গেট বাছাই করে নিতে পারেন - যারা দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞাত, তারা আপনার জালে আটকা পড়তে পারে। এ কারণেই হাদিস শরীফে আমাদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে যে, যারা পথভ্রষ্ট তারাই অপরদেরকে পথভ্রান্ত করবে।

শহরে একদল লোক আছে যারা উক্ত [নিজে নিজে দ্বীন পালনের] রাস্তায় বিশ্বাসী। এই অনুষ্ঠানটি তাদের জন্যই অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমাকে ডাকা হয়েছে, তাদের প্রতি দালায়িল পেশ করতে।

দালায়িল তো পাহাড়-পরিমাণ বিদ্যমান! কিন্তু বাস্তবে এখানে দলিলের প্রশ্ন নয়- বরং আসল মাসআলা হলো 'হিদায়াত'। একজন জাগতিক দুষ্কৃতকারী অনুতাপ করতে পারে। তার জন্য তখন হিদায়াতের দরজা উন্মুক্ত হবে। সবাই প্রকাশ্যে দুষ্কৃতকারীদের ঘৃণা করে। সমাজ তাদেরকে পরিত্যাগ করে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার দরজা তার জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত আছে।

এরপর আপনি একব্যক্তি পেলেন যে দ্বীনি ব্যাপারে দুষ্কৃতকারী। সে যে কেনো কারণেই হোক, ভুল-ভ্রান্তিতে আছে। তবে সে যদি তার অনুসন্ধান ও সদিচ্ছার ব্যাপারে আন্তরিক হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ! সে হিদায়াত লাভে ধন্য হবে। এরপর আপনি একজন প্রতারক পেলেন- একজন প্রবঞ্চনাকারী, অসৎ। সে-ও আছে ভুল-ভ্রান্তিতে- কিন্তু খুব কট্টর। সে একজন উদ্ধত ব্যক্তি। সে কখনও সত্যকে খুঁজে পাবে না। আপনি এরূপ অনেক শক্ত-কট্টর খ্রিস্টান ও কিছু শিয়া দেখতে পাবেন। পৃথিবীতে এদের সংখ্যা বেড়ে চলছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

"আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই।" [সূরা যুমার : ৩৬]

মানুষের উচিৎ, নিজেদের প্রাপ্তি নিয়ে ভাবা। তাদের উদ্দেশ্য কি, তাদের ইচ্ছা কি? বিষয়ের প্রতি ফিরে আসা যাক।

কুরআনের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা 'ইহসান' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। এখানে 'তাসাওউফের' ইহসান তা নয়, যা আমরা উল্লেখ করেছি। কুরআনে এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে 'মুহসিন' শব্দটি। এখানে 'ইহসান' অর্থ 'ইখলাস' [আন্তরিকতা]। এখানে দু'টি ব্যাপার উল্লেখিত হয়েছে: 'ইত্তিবা' ও 'ইখলাস'।

একটি উদাহরণ দেখি

মনে করুন এক মহল্লার সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকজন শাফিঈ মাজহাবপন্থী। তবে মসজিদের ইমাম কিন্তু হানাফি। মানুষের ইচ্ছা হলো, শাফিঈ মাজহাব মুতাবিক তিনি নামাজ পড়াবেন। এরূপ একটি বাস্তব ঘটনা সম্প্রতি ঘটেছিল এবং আমাদেরকে সঠিক মাসআলার জন্য জিজ্ঞেস করাও হয়েছিল। এ কারণে আমি বিষয়টির বর্ণনা দিচ্ছি। যাক, আসল কথা হলো এই লোকগুলোর দাবি কিন্তু সঠিক নয়। চারটি মাজহাবই হক্ব। সবগুলো সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে ‘হানাফি’, ‘শাফিঈ’, ‘মালিকী’ কিংবা ‘হাম্বলী’ নামাযের কোনো প্রশ্ন নেই। ইমাম যে মাজহাবেরই হোন না কেনো, মুক্বাল্লিদকে তাঁর অনুসরণ করতে হবে। এটাই নামাজ সঠিক হওয়ার শর্ত।

একদা এক তাবিঈ একজন সাহাবীকে প্রশ্ন করলেন: “আমি এক জোড়া চামড়ার মুজা [কুফ্‌ফাইন] পরেছি। কিন্তু প্রত্যেকবার অযুর সময় পা ধু’তে আমার ইচ্ছা হয়। এটা কি ঠিক হবে?” সাহাবী জবাব দিলেন: “না। এটা ঠিক নয়। কুফ্‌ফাইনের ওপর মাসাহ হলো সুন্নাত। এখানে ‘উত্তম’ বা আপনি কী ‘অনুভব’ করছেন এরূপ প্রশ্নের অবকাশ নেই। দ্বীনের যে কোনো ব্যাপারে আপনার মধ্যে কোনো সন্দেহ রাখবেন না। আপনাকে সুন্নাতের ওপর পূর্ণাঙ্গভাবে ইতমিনান [সন্তুষ্টি বা আস্থা] রাখতে হবে।” [তিরমিযী শরীফ]

অনুরূপ, মাজহাব পরিবর্তন বা সমন্বিতকরণের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। কারণ প্রত্যেক মাজহাবই সঠিক, পূর্ণাঙ্গ ও যথার্থ। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। হ্যাঁ, কোনো জনপদের লোকজন যদি শাফিঈ মাজহাবের অনুসারী হয়ে থাকেন এবং তাদের ইচ্ছা হয় একজন শাফিঈ ইমাম নিযুক্ত করবেন, যাতেকরে তারা তাঁর নিকট থেকে মাসাঈল ও শিক্ষাগ্রহণ করতে চান, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু নামাজের জন্য ইমাম পরিবর্তনের চেষ্টা মোটেই ঠিক নয়।

ইমাম যদি নিজেই সরে দাঁড়ান তাহলে সেটা হবে ইমাম শাফিঈর ইত্তিবা। কিন্তু এখানে কোনো ইখলাস থাকবে না। কারণ তাঁর এ কাজটি হবে

লোকদেরকে খুশি করার মানসে। তাদের আবেদন মুতাবিক ইচ্ছাপূরণ বৈধ নয়। কারণ এটা হবে, ইহসানের পরিপন্থী কাজ।

অপর কেউ হানাফী কিন্তু তিনি শাফিঈ ফিক্‌হ যথেষ্ট অধ্যয়ন করেছেন। তিনি এর উসূল ও ফুরূ' শিখেছেন। এই ফিক্‌হের ওপর তাঁর ইতমিনান [আস্থা[সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং এই জ্ঞানের আলোকে তিনি তাঁর মাজহাব পরিবর্তন করলেন। এটা সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন ব্যাপার। এরূপ কাজ আয়াতে যে 'ইহসান' বলা হয়েছে তার অনুকূলে হবে।

একটি অভিযোগ ও এর জবাব

কেউ হয়তো অভিযোগ তুলবেন, যে আয়াতটি দলিল হিসাবে আমরা উপস্থাপন করেছি [সূরা তাওবাহ : ১০০], তা বাস্তবে তাবুকের যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে নাজিল হয়েছে। এটা ব্যবহার করে তাক্বলিদের প্রমাণ সঠিক নয়।

হুজ্জিয়াতে হাদিসের প্রমাণ: একটি অভিযোগ

উক্ত অভিযোগের জবাব হলো সাধারণত কুরআনের আয়াত কোনো বিশেষ ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটাকে বলে উসূলে উমূম [সার্বজনীনতার মূলতত্ত্ব]। অর্থাৎ কুরআনের আয়াতের অর্থ ব্যাপক ও অধিক অর্থপূর্ণ।

উদাহরণস্বরূপ সূরা হাশরের এই আয়াতটির কথা বলা যায়, যার দ্বারা হাদিসের হুজ্জাত প্রমাণিত হয়েছে:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

".. রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক ... " [হাশর : ৭]।

এই আয়াতটির শানে নুযূল হলো, শান্তিচুক্তির পর যুদ্ধলব্ধ মালামাল বণ্টন [মা'লী ফায়ী][৮]। অথচ উমূমে কুরআনের আইনে, এই আয়াতের উপলক্ষ অনেক বেশি গভীর। এমনকি গায়র মুক্বাল্লিদরাও এটা গ্রহণ করেছেন। একইভাবে উপরোক্ত [সূরা তাওবাহ : ১০০] আয়াতের ক্ষেত্রেও সত্য।

প্রশ্নের উসূল হলো: 'আলইবরাতু লি উলূমিল-লাফ্‌জ লা- লি খুসূসিল মাওরিদ।' অর্থাৎ আয়াতের কোনো এক বা ততোধিক শব্দ যদি কোনো ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে, তাহলে এ'টি সাধারণ উপলক্ষে ব্যবহৃত হবে।

এটা একটি আলাদা বিষয়। উসূলুল ফিক্‌হ, উসূলুল হাদিস ও উসূলুত তাফসীর ও অন্যান্য বিষয়ের ওপর পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানার্জন ছাড়া, কারোর পক্ষে এমনকি একটিমাত্র মাসআলার ওপর একটিমাত্র হাদিস গবেষণা করে মতামত পেশ বৈধ নয়। এটাও অপর একটি বিরাট বিষয়।

সুতরাং উপরোক্ত উসূল হচ্ছে অভিযোগের জবাব।

আখবার-এ 'ইনশা' যুক্ত

অপর আরেক ইশকাল (অভিযোগ) হলো: আমর [অত্যাবশ্যক নির্দেশ] উজূবের [বাধ্যবাধকতার] জন্য আসে। আর উক্ত আয়াতে [সূরা তাওবাহ : ১০০] আমরের [নির্দেশের] কোনো সেগা [কাল] নেই।

এ প্রশ্নের জবাব নাহু (আরবি ব্যাকরণ) এর আইনে বিদ্যমান। 'আখবারে ইনশা' যুক্ত'। এর অর্থ, যদিও এখানে একটি বর্ণনা এসেছে কিন্তু এতে সম্পৃক্ত আছে একটি আমর [নির্দেশ]। আরবি ভাষার ছাত্ররা এ কথাগুলো সহজেই বুঝতে পারবেন। সাধারণ্যের জন্য এটাই বলা যথেষ্ট যে, দ্বীনের জ্ঞান ছেলেখেলা নয় যে, যে কেউ যাচ্ছেতাই বলে বেড়াবে!

যদি এসব গায়র মুক্বাল্লিদরা দ্বীনের জ্ঞানার্জনে গভীরে নিমজ্জিত হতেন, তাহলে তারা অনুধাবন করতেন মহাত্মন ইমামগণের জ্ঞানের ব্যাপ্তি কতো বিরাট ও গভীর ছিলো। তাঁদের জ্ঞানের মহিমা ও বিশালতায় সম্পূর্ণ

---

[৮]একটা হচ্ছে 'মালে গনিমত' - যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত মালামাল। যুদ্ধ শেষে ১/৫ অংশ বাইতুল মালে যাবে আর বাকি সব মাল বণ্টন করা হবে মুজাহিদদের মধ্যে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে 'মালে ফায়ী' - শান্তিচুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত মালামাল। এ ক্ষেত্রে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইখতিয়ার দেওয়া হয়। তিনি যেভাবে ভালো মনে করেন সেভাবেই বণ্টন করবেন।

অভিভূত হয়ে পড়তেন। অথচ এই লোকগুলো আজ 'ইলমে নববী'কে সাধারণ সংবাপত্র এবং ম্যাগাজিনের স্তরে নামিয়ে ফেলেছে! [এ যুগের আরেক মুফতি 'গুগলস্' দ্বারা অনুসন্ধানের কথাও কেউ কেউ বলেন! -অনুবাদক] যে কোনো ব্যক্তি একটি ম্যাগাজিন হাতে নিয়ে পাঠ করুক ও তার নিজের মতামত তুলে ধরুক- এরূপ উপদেশও দেওয়া হচ্ছে! সে তার নিজস্ব কলাম লিখে প্রকাশও করতে বাধা নেই। এমনকি, সে তার নিজস্ব সংবাদপত্রও প্রকাশ করতে পারে। আজকাল তারা দ্বীন নিয়ে এভাবেই জগাখিচুড়ি কারবার করতে চায়। আমরা একমাত্র আল্লাহর দরবারেই আশ্রয়প্রার্থী।

ফিরে আসছি আখবার ও ইরশা' এর আলোচনায়। একে এভাবে বুঝার চেষ্টা করুন:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

১. "যে আমানত রক্ষা করে না, তার কোনো ঈমান নেই।"

২. "মসজিদের আশপাশে বসবাসকারী কারোর নামায নেই মসজিদ ছাড়া।"

এই হাদিসদ্বয়ে সরাসরি কোনো আমর (নির্দেশ) নেই। উভয়টি হলো 'জুমলাহ খাবরিয়্যাহ' (তথ্যমূলক বাক্য)। অথচ এগুলোতে আমর (নির্দেশ) বিদ্যমান। প্রথম হাদিস 'আমর' যার মাধ্যমে আমানতের গুরুত্ব চিত্তনিষ্ঠ করা হয়েছে। দ্বিতীয় হাদিস মসজিদে নামাজ আদায়ের একটি 'আমর' (নির্দেশ)। এই উভয় আমল [আমানত রক্ষা ও পারতপক্ষে মসজিদে নামায আদায়] ওয়াজিব। অনুরূপ আমাদের আলোচিত আয়াতও হলো ইত্তিবা'র 'আমর' [অনুসরণের নির্দেশ]। সুতরাং ইত্তিবা একটি ওয়াজিব আমল।

তাক্বলিদ: একমাত্র রাস্তা

পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা ও দলিলাদির আদান-প্রদান ছাড়াও, বলা যায় তাক্বলিদ হচ্ছে একটি যৌক্তিক বাধ্যবাধকতা। বাস্তবে কেউ তাক্বলিদ ছাড়া একটিমাত্র পদক্ষেপও নিতে পারবে না। সুতরাং, 'আপনি অনুসরণ

করবেন কি না' সেটা প্রশ্ন নয়- বরং 'কার অনুসরণ করবেন' সেটাই হলো আসল প্রশ্ন। কিয়ামতের দিন ঘোষণা করা হবে, দুনিয়াতে থাকতে যার অনুসরণ করেছিলে তার সঙ্গ ধরো। এভাবেই হিন্দুরা শিখদের থেকে আলাদা হবে এবং শিখরা শিয়াদের থেকে...।

গায়র মুক্বাল্লিদরাও তাদের 'উলামা'র অনুসরণ করে। তারা তাদের তাক্বলিদের ক্ষেত্রে খুবই কট্টর!

তারা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে: 'আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না আবু হানিফার অনুসরণ করেন?' এই প্রশ্নটি অবান্তর। সঠিক প্রশ্ন হবে: 'আমরা কি আবু হানিফাকে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নেবো না বিভ্রান্ত গায়র মুক্বাল্লিদ ফিরকার অনুসরণ করবো?'

ইমাম আবু হানিফার মাজহাব [বা ফিক্‌হ] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুমের থেকে সংগ্রহিত। আর ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু সকল সাহাবাদের মতো আল্লাহর রাসূলের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন।

গায়র মুক্বাল্লিদ গোষ্ঠি সৃষ্টি হয়েছে 'মুক্তচিন্তার' দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন জগাখিচুড়ি ধারণার মাধ্যমে। এরপর তারা আবার নিজেদেরকে হাদিস অনুসরণের জিগরে উপস্থাপন করে। তারা খুব কট্টরভাবে 'তাক্বলিদ' শব্দের বিরোধী। এ সবই 'জাহিলিয়্যাত' [অজ্ঞতা] ও 'দ্বালালাত' [পথভ্রষ্টতা] ছাড়া আর কিছুই নয়।

৩টি বিষয়ে তাক্বলিদ আবশ্যিক

যেসব ব্যাপারে কুরআন ও হাদিসে সুস্পষ্ট নির্দেশনা আছে সেগুলোর ওপর ইমামদের মধ্যে কোনো মতানৈক্য নেই। তিনটি মাত্র বিষয়ে ইমামদের মধ্যে ভিন্নমত বিদ্যমান:

১. যেখানে স্ববিরোধী (মুখতালিফ বা মুতাআ'রিদ) বর্ণনা পাওয়া যায়, যেমন: রাফে ইয়াদাইনের মাসআলা [নামাযের তাকবিরে উলার পর অন্যান্য তাকবিরের সময় হাত উত্তোলন]। এ ধরনের স্ববিরোধী

বর্ণনাসম্বলিত মাসআলার ক্ষেত্রে ইমামরা তাঁদের যারতার উসূল মুতাবিক সিদ্ধান্ত নেবেন।

২. কোনো সময় একই হাদিসের বাহ্যত দু'টি অর্থ হতে পারে। ইমাম এর যে কোনো একটির ওপর আস্থা রাখবেন এবং তাঁর মুক্বাল্লিদরা এটাই অনুসরণ করবেন। যেমন নিচের উদাহরণটি।

এক হাদিস: দু'টি অর্থ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে আযান দিতে বললেন জোড়ায় জোড়ায় আর ইক্বামত এক এক (বিজোড়) সংখ্যায়। [এ হাদিসটি নিয়ে ইতোমধ্যে আলোচনা হয়েছে। -অনুবাদক]

এই হাদিসের দু'টি অর্থ হতে পারে: ১. ইক্বামাতের সকল শব্দ একবার করে বলা। তিনজন ইমাম এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। ইমাম মালিকের মতে 'ক্বাদ ক্বামাতিস সালাত'-ও একবার বলতে হবে।

২. ইমাম আবু হানিফার মতে 'এক এক' মানে ইক্বামাতের দু'টি বাক্য একই শ্বাসে বলতে হবে। তাঁর এই মতামতের স্বপক্ষে (পরবর্তীতে) আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত এই হাদিসটি তিনি তুলে ধরেছেন:

"হযরত আবু মাদ্বহূরা রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইক্বামতে ১৭টি বাক্য উচ্চারণ করতে বলেছেন।" [হযরত মাদ্বহুরা মসজিদে নববীর একজন মুয়াজ্জিন ছিলেন।]

৩. কোনো কেনো মাসাঈল নাস [কুরআন ও হাদিস] -এর মধ্যে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয় নি। এরূপ ক্ষেত্রে ইমাম তাঁর পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান-প্রজ্ঞাসহ কুরআন ও হাদিসের গভীরে নিমজ্জিত হয়ে সঠিক উত্তর বের করার চেষ্টা করবেন। এ উপায়ে প্রাপ্ত সমাধানকে বলে 'ইস্তিমবাতী মাসাঈল' [বেরহওয়া মাসাঈল]।

উপরোক্ত তিনটি অবস্থায় সঠিক আমল একমাত্র ইমামের তাক্বলিদ ছাড়া সম্ভব নয়। [কারণ, এ তিনটি ক্ষেত্রেই কোনো সাধারণ মুসলমান সঠিক পথ আবিষ্কারের সামর্থ রাখেন না। -অনুবাদক] তবে যেখানে কুরআন ও

হাদিসে স্পষ্ট নির্দেশনা বিদ্যমান, সেখানে কারোর ইত্তিবার প্রয়োজন পড়ে না। [যদিও কুরআন ও হাদিসের ওপর অপর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী কাউকে অবশ্যই কোনো বিজ্ঞ আলিমকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হবে সঠিক আমল কোনটি।- অনুবাদক]

আর মনে রাখবেন, কোনো ইমামই তাঁদের সিদ্ধান্তে কোনো হাদিসের বিরোধী বা পরিপন্থী কস্মিনকালেও ছিলেন না! এসব মহাত্মন ব্যক্তিদের ওপর এটা একটি মারাত্মক অপবাদ। অপবাদকারীদের ফাঁদে আটকা পড়বেন না- খবরদার!

তাক্বলিদের ‘দলিল’ দাবি করা সঠিক নয়

ওয়াজিবের ধরন দু’টি:

১. ওয়াজিব লি আইনী (যেখানে কোনো কিছু নিজেই ওয়াজিব)।

২. ওয়াজিব লি গ্বাইরিহি (যেখানে কোনো কিছু স্বয়ং নিজে ওয়াজিব নয়, বরং ওয়াজিব হয়েছে অপর কোনো বাহ্যিক কারণে)।

প্রথম ধরনের ওয়াজিবের দালাইল অনুসন্ধান বৈধ। যেমন, হানাফিরা বলেন, বিত্‌র একটি ওয়াজিব আমল। তাদেরকে কেউ দালায়িল উপস্থাপনের দাবি জানালে তা দেখাতে হবে। এটা বৈধ কাজ।

কিন্তু দ্বিতীয় ধরনের ওয়াজিবের দলিলের অনুসন্ধান বৈধ নয়। এর কারণ হলো, এই ওয়াজিবটি নির্ভর করছে অপর আরো কিছু বিষয়ের ওপর। সুতরাং প্রথমে দেখতে হবে, ঐ অপর বিষয়টি কতটুকু সঠিক। এটা যদি শক্ত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে তাহলে এ থেকে উদ্ভূত ওয়াজিবটিও ঠিকে থাকবে- অন্যথায় নয়।

তাক্বলিদের উজূব

তাক্বলিদ হচ্ছে 'ওয়াজিব লি গ্বাইরিহি'। এটা নির্ভরশীল অপর কোনো অবস্থার ওপর। আর এ অপর অবস্থা হলো 'আদমুল ইল্‌ম' বা 'ক্বিল্লাতুল ইল্‌ম' [জ্ঞান না থাকা বা পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকা]। যে কোনো ব্যক্তি যদি এই অবস্থার অন্তর্গত হয়, তাহলে জ্ঞানবান কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে, না হয় জ্ঞানবানদের অনুসরণ করতে হবে। এটা তার জন্য ওয়াজিব। তার জন্য নিজে নিজে সিদ্ধান্তগ্রহণ হারাম। আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করেছেন:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"অতএব জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে।" [সূরা নাহল : ৪৩]

উপরোক্ত আয়াতের আলোকে প্রত্যেকে নিজের জ্ঞানের মানদণ্ড বিবেচনা করুন। এটাই হচ্ছে সর্বোচ্চ সত্য এবং এতে ব্যক্তিগত কোনো উদ্দেশ্য নিহিত নেই। এটাই সরল রাস্তা।

ভ্রান্তির একটি বড়ো কারণ: ভ্রান্তদের তাক্বলিদ

আগেই বলেছি, আমাদের আলোচনার বিষয় হিসেবে শিরোনাম দেওয়া হয়েছিল: 'তাক্বলিদ পরিত্যাগ: ভ্রান্তির একটি বড়ো কারণ'। আমি একে পরিবর্তন করেছি: 'ভ্রান্তির একটি বড়ো কারণ: ভ্রান্তদের অনুসরণ।' এর কারণ হলো, জীবনচলার পথে এবং বিশেষকরে দ্বীন পালনে তাক্বলিদের বিকল্প নেই। তাক্বলিদকে উপেক্ষা করা যায় না। সবাই মুক্বাল্লিদ। সুতরাং প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি কা'কে অনুসরণ করছেন? [অর্থাৎ কার তাক্বলিদ করছেন?]

আপনি চাইলে মহাত্মন ইমামদের অনুসরণ করতে পারেন যাঁদের জ্ঞান ও তাক্বওয়া [আল্লাহভীতি] ছিলো পর্বতসম।

অথবা অনুসরণ করতে পারেন না-বালিগ [অপরিপক্ক] মাশরুমদের, যারা সময় সময় গজে ওঠে। কতগুলো মাশরুম যাদের মূল্য এক পয়সা প্রতি ঝুড়িভর্তি!

চার মাজহাবের যে কোনো একটি অনুসরণের গুরুত্ব ও এর বৃত্তের বাইরে পদক্ষেপের মধ্যে বিরাট ঝুঁকি (শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহ.-এর লেখা থেকে)।

চার মাজহাবের যে কোনো একটির অনুসরণের মূলে নিহিত আছে গভীর প্রজ্ঞা ও হিকমাত। এ পন্থাবলম্বনের মাধ্যমে ঈমানের সংরক্ষণ হয়। এ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বিচ্যুতি ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং এ থেকে অচিরেই উন্মুক্ত হবে বিশৃঙ্খলা ও দ্বন্ধ। এরূপ পরিণতির তিনটি কারণ আছে:

কারণ ১

দ্বীনের ব্যাপারে সালাফদের [পূর্ববর্তীদের] ওপর উম্মত নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতার নাম ‘ই’তিমাদ’। তাবিঈন সাহাবায়ে কিরাম থেকে দ্বীন গ্রহণ করেন এবং তাঁদের ছাত্ররা [তাবে-তাবেঈন] দ্বীন লাভ করেন তাবেঈনের কাছ থেকে। ঠিক এভাবে [উস্তাদ থেকে ছাত্রদের মাধ্যমে] প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম পর্যন্ত দ্বীনের প্রসার লাভ করেছে।

প্রত্যেক যুগের উলামা তাঁদের মুতাক্বাদ্দিমীনের [পূর্বসূরিদের] ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। দ্বীন আমাদের পর্যন্ত ঠিক এভাবে পৌঁছুয়েছে। দ্বীনের এই শিকলের নাম ‘তাওয়ারুত’।

দ্বীনের জ্ঞানের ভিত্তি ‘নাক্বল’ বা ‘রিওয়ায়েত’ [বর্ণনা] এবং ‘ইসতিম্বাত’ [বিয়োজন] এর ওপর।

এর উভয়টি আবার নির্ভরশীল ‘ই’তিমাদ’ [পূর্বসূরিদের জ্ঞানের] ওপর। এভাবেই আমরা আমাদের পূর্বসূরিদের থেকে দ্বীন পেয়েছি এবং পরবর্তীদের নিকট পৌঁছুয়ে দিচ্ছি।

এই 'তাওয়ারুত' [প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে দ্বীনকে পৌঁছুয়ে দেওয়া] এর ওপর উম্মতের মতৈক্য [ইজমা] হয়েছে। আর ইজমা হচ্ছে সর্বাধিক শক্ত ভিত্তি যার ওপর সমগ্র দ্বীনের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত।

একে পরিত্যাগ করলে সূত্রপাত ঘটবে দুষ্টুমি ও ভ্রান্তির।

শুধু দ্বীনের ক্ষেত্রে নয়, জীবনের প্রত্যেক পদক্ষেপে এটা প্রযোজ্য। যাবতীয় পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও একই আইন-কানুন বর্তায়। যে কোনো বিষয়ের ওপর জ্ঞানার্জন করতে হবে উস্তাদের নিকট থেকে। এরপর ঐ বিষয়ে ছাত্রই শেষ পর্যন্ত উস্তাদ হবেন। কোনো ব্যক্তিই নিজে নিজে অধ্যয়ন করে একজন ডাক্তার কিংবা আইনজীবী হতে পারবেন না। কেউ যদি এরূপ দাবিও করে, সেটা মানুষ মানবে না।

এটাই হলো প্রথম পদক্ষেপ। অর্থাৎ 'ই'তিমাদ' [আস্থা] থাকতে হবে আমাদের সালাফ বা পূর্বসূরিদের আক্বওয়ালে [কথায়]।

এরপর এই ক্বউল [কথা - বর্ণনা] এর মধ্যে সঠিক সনদ [বর্ণনার শিকল] থাকা চাই। কিংবা এটা সংরক্ষিত হতে হবে কোনো নির্ভরযোগ্য কিতাবে। এছাড়া এই ক্বউলটি প্রত্যেক প্রজন্মের উচ্চপর্যায়ের উলামা কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে। এভাবেই নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে ক্বউলটি থেকে মাসআলা বের করতে হবে।

১. 'ইহতিমালাত' [সম্ভাব্যতা] ওজন করার পর, 'রাজিহ' [অধিক শ্রেষ্ঠ] ক্বউলটি সংজ্ঞায়িত [তারজীহুল মুহতামাল] করতে হবে।

২. সাধারণ মাসআলা সুনির্দিষ্টকরণ [তাখসিসে আম]।

৩. সাধারণ মাসআলা স্পষ্টকরণ [তাক্বঈদুল মুত্বলাক্ব]।

৪. অবশেষে মুখতালাফ [মতপার্থক্যবিশিষ্ট] মাসআলাগুলো একত্রিত [জামা'] করতে হবে তাদের ধারা ও প্রমাণাদিসহ [ইল্লাত ও দালায়িল]।

যতক্ষণ না উক্ত প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে সবকিছু পরিষ্কার হবে, যে কোনো ক্বউল পূর্ণ ই'তিমাদসহ গ্রহণের অনুমতি নেই।

আজকের যুগে, উক্ত চারটি মাজহাব ছাড়া পঞ্চম কোনো মাজহাব বা ফিক্হ নেই যা এরূপ পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহর অনুগ্রহে

এই চারটি মাজহাবের মধ্যেই দ্বীনের সকল খুঁটিনাটি বিষয় পূর্ণাঙ্গভাবে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। এ চারটির বাইরে বিচরণশীল যে কোনো ব্যক্তি অচিরেই কিংবা কিছুদিন পরে অবশ্যই নিজেকে বিভ্রান্তির মধ্যে পতিত করবে। গায়র মুক্বাল্লিদদের বড়ো দাবিগুলো মূলত খুব নড়বড়ে ও অগভীর।

'ইমামী' ও 'জায়িদী'[৯] মাজহাব কিছু 'ফুরূ' [সম্পূরক] মাসাঈলে অনুপুঙ্খভাবে বর্ণিত আছে। কিন্তু এদের উসূল বাতিল। তারা হচ্ছে 'ফিরাক্বে দ্বালালাহ' [গোমরাহ দলদের] এর অন্তর্ভুক্ত।

কারণ ২

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "দ্বীনের ক্ষেত্রে 'সাওয়াদে আজম' [বড় দলের] এর অনুসরণ করো।"

এটা হলো প্রাথমিক যুগ থেকে সর্বদা বিদ্যমান উম্মাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। আর এরাই হচ্ছেন 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত'। আহলে সুন্নাহের মধ্যেও এক সময় অন্যান্য মাজহাব ছিলো। কিন্তু ক্রমান্বয়ে সবগুলো চূড়ান্ত চারটি মাজহাবের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। আর এই চারটিই এখন 'সাওয়াদে আজম' এবং এদের অনুসরণ অবশ্যকরণীয়।

কারণ ৩

আজকের বহুতরের ফিতনার যুগে, যেখানে আমানাহ বা বিশ্বাসের মাত্রা খুব অল্প এবং তাক্বওয়া সর্বনিম্নে, একজন ঈমানদারকে আরো বেশি সতর্ক থাকা একান্ত জরুরী। কোনো 'নতুন' পথ যার ভিত্তি তথাকথিত 'আলোকপ্রাপ্ত' ব্যক্তির ওপর, এ যুগে অনুসরণ করা মোটেই বৈধ ও নিরাপদ নয়। সর্বাধিক আপদমুক্ত রাস্তা হচ্ছে জমহুর আকাবিরে কিরাম ও আহলুল্লাহদের। আর অপর রাস্তাটি হলো নফসে আম্মারার তথা

[৯] শিয়াদের দু'টি প্রধান দল।

আত্মতৃপ্তির ও শয়তানের প্ররোচণার। অনুরূপ কোনো অজ্ঞ ব্যক্তি যে শরীয়তের শর্তাবলী মুতাবিক অনুসরণযোগ্য নয়, তার অনুসরণও সম্পূর্ণ অবৈধ।

আমরা যদি মুক্বাল্লিদ উলামায়ে কিরামের প্রতি লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাবো তাঁরা দৃঢ়ভাবে এমন একটি রাস্তার উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন, যার ভিত্তিমূল তৈরি করেছেন আসলাফে কিরাম। তাঁদের কাছ থেকে এ পথের পূর্ণাঙ্গ দিক-নির্দেশনা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এসেছে প্রত্যেক যুগের আহলুল্লাহর মাধ্যমে। এছাড়া, তাঁদের সকল আক্বওয়াল কুরআন-সুন্নাহ থেকে সম্পূর্ণরূপে গবেষণালব্ধ।

অপর একটি দলও আজকাল দাবি করে, সালাফদের রাস্তার পথিক এবং তারা অনুসরণ করে হাদিসকে। কিন্তু গভীর অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে যে, এরা বাস্তবে যা তারা দাবি করে, তার বিরোধী বৈ নয়।

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন: “ইসলাম ওসব মুনাফিকদের দ্বারা ধ্বংস হবে, যারা কুরআন ব্যবহার করে সৃষ্টি করবে মতদ্বৈধতা।”

হযরত ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন: “যারা অতীত হয়েছেন তাঁদের রাস্তা অনুসরণ করো। খুব শক্তভাবে আকাবিরদের পথে দৃঢ় থাকো।”

‘আক্বদুল জাঈদ’ নামক গ্রন্থের তৃতীয় অংশে শাহ ওয়ালিউল্লাহ সাহেব লিখেছেন, তাক্বলিদ ২ ধরনের:

১. ওয়াজিব।

২. হারাম।

আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের তাক্বলিদ হলো ওয়াজিব। এই তাক্বলিদ হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাতের উপর সঠিক আ’মল।

তিনি আরো বলেন, ‘কেউ যদি দ্বীনের জ্ঞান-বিজ্ঞানে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানবান না থাকে, তাহলে ঐ ব্যক্তির জন্য যে কোনো দ্বীনি মাসআলা নিজে নিজে

বের করা অসম্ভব। এ ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব হবে সকল দ্বীনি বিষয়ে কোনো নির্ভরযোগ্য আলিম বা ফকীহ্ ব্যক্তির সাথে নিজেকে যুক্ত রাখা। এরপর অনুসরণ করতে হবে একজন ফকীহ্ ব্যক্তির যার জবাব হতে পারে শারীহ নাস[১০], ইসতিম্বাত[১১] কিংবা ক্বিয়াস[১২] যা সঠিক সুন্নাতের আ'মল হিসাবে বিবেচিত হবে। এটা হতে পারে সারাহাতান [প্রত্যক্ষ] হাদিসের আ'মল কিংবা দ্বালাতান [অপ্রত্যক্ষ] হাদিসের আ'মল। এই পদ্ধতি উম্মাত গ্রহণ করেছে স্বয়ং সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে এবং পরবর্তী যুগসমূহে। এর ওপর উম্মাতের ইজমা' হয়েছে।'

চার ইমামের তাক্বলিদের ওপর উম্মাতের ইজমা'

আহলে হাক্ব এর মধ্যে এবং প্রত্যেক যুগের শীর্ষস্থানীয় উলামার মধ্যে চার মাজহাবের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে মতৈক্য বা ইজমা' হয়েছে। এই ইজমা' এ যুগ পর্যন্ত অনড় অবস্থানে আছে এবং এর মধ্যেই নিহিত বিরাট নিরাপত্তা। বিশেষকরে আমাদের এ যুগে যেখানে চতুর্দিক থেকে খারাপীর উত্থান ঘটছে, মানুষ বেশি বেশি নফসে আম্মারার গোলামিতে লিপ্ত হচ্ছে এবং প্রত্যেক অপরিপক্ক ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে যাচ্ছেতাই ব্যাখ্যা দিচ্ছে- শক্তভাবে মাজহাবের অনুসরণ আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেছে।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ সাহেব তাঁর 'আল-ইনসাফ' গ্রন্থে লিখেছেন, 'দ্বিতীয় শতকে আমরা দেখেছি ফিতনার উত্থান ও ইলমের হ্রাস। এরপর আল্লাহর ইচ্ছায় তাক্বলিদের ভিত মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর খুব অল্পজনই অবশিষ্ট ছিলেন যারা যে কোনো মুতা'আঈন (বিশেষ) মুজতাহিদের অনুসরণ করেন নি। আর ঠিক সে যুগের মতো এ যুগেও এই তাক্বলিদ ওয়াজিব হিসাবে বহাল আছে ...।'

---

[১০] একটি সুস্পষ্ট আয়াত বা হাদিস।
[১১] কুরআন কিংবা হাদিস থেকে বের-হওয়া কোনো শরঈ মাসআলা।
[১২] ক্বিয়াসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত কোনো শরঈ আইন বা মাসআলা।

কখন তাক্বলিদ বৈধ নয়?

‘হাজামিয়্যাহ’ [বা জাহিরী] ফিরক্বার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইবনে হাজম জাহিরী আন্দালুচী (৩৮৪-৪৫৬ হি.)। তিনি তাক্বলিদ হারাম হওয়ার পক্ষে মতামত দিতেন। বলতেন, একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কারোর তাক্বলিদ বৈধ নয়। তিনি এ সিদ্ধান্তের পক্ষে দলিল পেশ করতেন:

১.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

“আর যখন তাদেরকে কেউ বলে যে, সে হুকুমেরই আনুগত্য কর যা আল্লাহ তা’আলা নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে কখনো না, আমরা তো সে বিষয়েরই অনুসরণ করব যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে দেখেছি যদিও তাদের বাপ দাদারা কিছুই জানতো না, জানতো না সরল পথও।” [বাক্বারা : ১৭০]

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

“যারা শয়তানী শক্তির পূজা- অর্চনা থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয়, তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ অতএব, সুসংবাদ দিন আমার বান্দাদেরকে। যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা শুনে, অতঃপর যা উত্তম, তার অনুসরণ করে তাদেরকেই আল্লাহ সৎপথ প্রদর্শন করেন এবং তারাই বুদ্ধিমান।” [যুমার : ১৭-১৮]

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ

" ... তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর।" [নিসা : ৫৯]

[তিনি [জাহিরী] উক্ত আয়াতের প্রথমাংশ ছেড়ে দিয়েছেন যেখানে বলা হয়েছে: 'হে ঈমানদারগণ আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের' অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেন, উ'লিল আমর [বিচারক] -মানে মুজতাহিদ ইমাম। -অনুবাদক]

অনুরূপ কিছু আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাড়া অন্য কারো ইত্তিবা' বৈধ নয়। [ঠিক যেভাবে আজকের গায়র মুক্বাল্লিদরা বলে থাকে- অনুবাদক]

২.

তিনি বলেন, এই তাক্বলিদ সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈনের সময় বিদ্যমান ছিলো না। আর তাঁদের সময়ই ছিলো সর্বোত্তম যুগ। সুতরাং আবু হানিফা, শাফিঈ, মালিক ও হাম্বলের অনুসারীদের উচিৎ হবে মনোযোগ দেওয়া! এভাবে যে কোনো একক ব্যক্তির মতামতকে অনুসরণ করা মু'মিনদের কাজ নয়।

৩.

তিনি আরো বলেন, ফুক্বাহায়ে কিরাম নাকি উক্ত ইমামদের অনুসরণ করতে মুসলমানদের নিষেধ করেছিলেন।

৪.

তার ও তার অনুসারীদের প্রশ্ন, কোন্ ভিত্তিতে উক্ত ইমামদের তাক্বলিদ করবেন? উমর, আলী, ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুম কিংবা অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের তাক্বলিদ নয় কেনো? তাক্বলিদ যদি গ্রহণযোগ্য হতো, তাহলে তো তাঁদের তাক্বলিদ উচিৎ ছিলো! তাঁরা তো অনেক বেশি অনুসরণযোগ্য।

জবাবে শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন:

"উক্তসব যুক্তি শুধুমাত্র চার ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। যথা:-

১. ঐ ব্যক্তি যার মধ্যে ইজতিহাদের যোগ্যতা আছে। মুজতাহিদের জন্য তাক্বলিদ বৈধ নয়।

২. যদি কারোর নিকট এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোনো বিষয়ে রাসূলুল্লাহর নির্দেশ এরূপ-সেরূপ। এক্ষেত্রেও কিন্তু তাঁর মধ্যে থাকতে হবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর সুস্পষ্ট জ্ঞান যে, এটা খাস না মানসূখ না অন্যকিছু। এরূপ ক্ষেত্রে দু'টি পদ্ধতি আছে:

* তিনি মাসআলাটি যাবতীয় মুআফফিক ও মুখাল্লিফ দালাইল [বিভিন্ন প্রমাণ] দ্বারা পূর্ণাঙ্গরূপে অনুসন্ধান করেছেন সরাসরি এর সূত্র থেকে। তাঁর নিকট নাশখ্ [রহিতকরণ] এর দলিলও থাকা চাই।

* তিনি পক্ষে ও বিপক্ষের সকল উলামার মতামত যাচাই-বাছাই করেছেন।

এরূপ পদক্ষেপ ছাড়া কারোর পক্ষে কোনো হাদিসের [প্রতিষ্ঠিত মাসাঈলের] বিরোধিতা একমাত্র নিফাক্ব [কপটতা] কিংবা জাহালাত [অজ্ঞতা] ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে যেয়ে আল্লামা ইয্যুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন:

"খুব আশ্চর্যের ব্যাপার যে, যারা নিজেদের হুজ্জাতের [প্রমাণাদির] ব্যাপারে দুর্বলতা আছে জেনেও তারা তাদের ইমামকে অনুসরণ করতে থাকে, অপরদিকে বিপরীতমুখী মতামতের পক্ষে কুরআন ও হাদিসে দালাইল অনেক হওয়া সত্ত্বেও? কেউ কেউ তাদের ফিক্হ তথা মতামতকে প্রমাণ করতে যেয়ে কুরআন ও হাদিসের অর্থকে পর্যন্ত বক্র করে দিতেও দ্বিধা করে না! তারা নিজেদের ইমাম ও ফিক্হকে রক্ষা করতে যেয়ে অনেকদূর অগ্রসর হয় ও নিয়ে আসে অশুদ্ধ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ।"

৩. একজন সাধারণ ব্যক্তি যিনি বিশেষ কোনো ইমামের অনুসরণ করা পছন্দ করেছেন। তিনি তাঁকে ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত মনে করেন। এই লোকটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যে কোনো অবস্থায় তাঁর ইমামকে তিনি মেনে নেবেন। এমনকি তাঁর [ইমামের] ধারণা ও সিদ্ধান্তে ভুল-ভ্রান্তি ও দালায়িলের অভাব থাকলেও ঐ ব্যক্তি তাঁর অনুসরণ করবে। এরূপ লোক

সম্পূর্ণ জাহিল। [যেমনটি আজকের দ্বীন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ তথাকথিত সালাফিরা 'ইবনে বায', 'আলবানি' ও 'উসাইমিন' প্রমুখদের অন্ধ অনুসরণ করে থাকে। -অনুবাদক]

তিরমিযী শরীফের হাদিসে আছে: আবি ইবনে হাতিম রাদ্বিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সূরা তাওবাহর এই আয়াতটি:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

"তারা তাদের পতি ও সংসার -বিরাগীদিগকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত .." জিজ্ঞেস করলেন, তিনি জবাব দিলেন, "তারা তাদের বানানো 'হালাল' ও 'হারাম' সিদ্ধান্তের অনুসরণ করেছিলো যদিও বাস্তবে তারা উপাসনা করে নি।" [তিরমিযী, খ.২, ১৩৬, কিতাবুত তাফসীর] [উল্লেখ্য, হাদীসে উল্লেখিত আয়াতটি ইয়াহুদীদের ভ্রান্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। এতে মুসলমানদের জন্য তাক্বলিদের গুরুত্ব খর্ব হয় না- যা গায়র মুক্বাল্লিদরা বলে থাকে। - অনুবাদক]
সুতরাং এভাবে ভ্রান্ত ইমামদের অন্ধ অনুসরণ হারাম।

৪. তাক্বলিদে কট্টরতা বৈধ নয়। যেমন, কেউ যদি অপর মাজহাবপন্থী কোনো ইমামের পেছনে নামাজ পড়তে অস্বীকার করে।

আমরা যে চার মহাত্মন ইমামের তাক্বলিদ করি তা অবশ্যই হারাম নয় বরং সময় সময় তা ওয়াজিব।

কেউ নিশ্চিতভাবে এটা মেনে নেয় যে, দ্বীন কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে পৌঁছুয়ে দিয়েছেন। আবার যে কোনো একজন মুজতাহিদ ইমামের অনুসরণ করে এই জেনে যে, ইমাম সাহেব কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত দ্বীনের সঠিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন উত্তমভাবে আমলের জন্য। এর কারণ হলো, সে নিজে দ্বীনের কোনো স্কলার নয়। অর্থাৎ ইলমে দ্বীনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তার সম্মুখে স্পষ্ট নয়। মূল সূত্রগুলো থেকে দ্বীনের মাসাঈল বের করার ক্ষমতাও তার নেই। মুসলিম উম্মাহর প্রায় সবার অবস্থা এরূপই। তাদের একমাত্র ভরসা হলেন কোনো শিক্ষিত, গ্রহণযোগ্য, আল্লাহওয়ালা

আলিম। এই আলিম ইসলাম তার মূল সূত্রগুলো থেকে অধ্যয়ন করেছেন। তিনি আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের মধ্যে পার্থক্য ও তাঁদের দালায়িল সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানবান। তিনি আক্বাঈদের উসূল অধ্যয়ন করেছেন। অধ্যয়ন করেছেন ফিক্হ ও হাদিসের উসূল ইত্যাদি। এরূপ তাক্বলিদ প্রশংসনীয়-এমনকি ওয়াজিব!

কোনো মুক্বাল্লিদই বিশ্বাস করেন না, তাঁর ইমাম সম্পূর্ণরূপে ভুলের ঊর্ধ্বে। সুতরাং তাঁর পক্ষে দ্বীন সম্পর্কে যাচ্ছেতাই বলারও অধিকার নেই। কেউ কোনোদিন বলে নি, এই তাক্বলিদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ইতা'আত [আনুগত্য] থেকেও একটি ফরয আমল। কেউ কোনোদিন বিশ্বাস করেনি যে, ইমামরা মা'সূম [নিষ্পাপ]।

সর্বোপরি কোনো ইমামই উক্তরূপ দাবিও করেন নি। কোনোভাবেই তাঁরা কোনো একটি ক্ষেত্রেও কুরআন ও হাদিসের বিরোধিতা করেন নি। বাস্তবে, তাঁরা তাঁদের পুরো জীবনই ইসলামের খিদমাতে উৎসর্গ করেছেন। তাঁরা দ্বীনের আইন-কানুন সংকলন করেছেন যাতেকরে আগত প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম এর অনুসরণ স্পষ্ট ও সহজভাবে করতে সক্ষম হয়। তারা তাঁদের যাবতীয় কর্ম কুরআন ও হাদিসের উপর ভিত্তি করে আঞ্জাম দিয়েছেন। এসব মহাত্মনের মধ্যে অপর কোনো কিছু করার সময় কিংবা আকাঙ্ক্ষা পর্যন্ত ছিলো না!

কে আছে যে, তাঁদের কর্মের বিরোধিতা করে?

মাসাঈল তিন ধরনের:

১. ওসব মাসাঈল যাদের কথা কুরআন কিংবা হাদিসে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

২. ওসব মাসাঈল যেগুলো কুরআন বা হাদিস থেকে বের করা হয়েছে [মুসতাম্বাত]।

৩. ওসব মাসাঈল যার উল্লেখ কুরআন বা হাদিসে নেই।

প্রথম দুটি ধরন সুস্পষ্ট। কিন্তু তৃতীয়টির ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইমাম একটি ইল্লাত [পূর্ণাঙ্গ ধারা] বের করার চেষ্টা করবেন যার ওপর নির্ভর করে তিনি উল্লেখিত মাসাঈলের ভিত প্রতিষ্ঠা করবেন। এটাকেই বলে ক্বিয়াস।

যেহেতু ক্বিয়াস সঠিক কিংবা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাই ক্বিয়াসকে 'দলিলে জান্নী' বা মাধ্যমিক প্রমাণ বলে।

হাদিসের সম্মুখে কোনো মুজতাহিদ কখনো ক্বিয়াসের মাধ্যমে নিজের মতামত দেবেন না। এই ক্বিয়াস কখনো আমরা গ্রহণ করবো না। আর এটাই হচ্ছে আমাদের সকল ইমামের মাজহাব।

ইমামরা ফিক্হ, হাদিস ও ইসতিদলালে তাঁদের উসূলের ক্ষেত্রে ভিন্নমতাবলম্বী হতে পারেন। আর এ কারণেই কিছু কিছু মাসআলার ক্ষেত্রে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। উলামায়ে কিরাম এসব পার্থক্যের কারণ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছেন। কিন্তু মুক্বাল্লিদরা হাদিস বিরোধী বলে অভিযোগ? তা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন।

গায়র মুক্বাল্লিদ ফিরক্বার ব্যাপারে শরঈ হুকুম

(রাসূলুল্লাহিল ওয়াসি'আহ গ্রন্থ, খ.২ থেকে)

কিছুদিন পূর্বে আমরা নিম্নোক্ত প্রশ্নটি প্রাপ্ত হই। এখানে জবাবসহ এটির পুনরুল্লেখ করছি।

প্রশ্ন: মিস্টার মওদুদীর দল ও গায়র মুক্বাল্লিদ ফিরক্বার ব্যাপারে শরঈ হুকুম কি?

তারা কি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত? দয়াকরে দালাইলসহ জবাব দিন।

উত্তর: এরা হচ্ছে দু'টি ইসলামী ফিরক্বা, যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে আলাদা। এর কারণ হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সঙ্গে তাদের পার্থক্য উসূলী [মূলতাত্ত্বিক] এবং ফুরূ'তে [সম্পূরক বিষয়াদিতে] নয়।

দলিল ১

মহাত্মন হানাফি ফকীহ ও আল্লামা শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উস্তাদ আল্লামা তাহতাওয়ী [১২৩১ হি.] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর প্রণীত দুররুল মুখতার গ্রন্থের হাশিয়ায় লিখেছেন:

“সুতরাং এটা তোমাদের ওপর শর্ত, হে মুসলমানগণ! আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পন্থাবলম্বন করা যেটিকে নাযাতপ্রাপ্ত দল হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁদের রাস্তা হলো আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাওফিক্বের রাস্তা। এদের বিরোধিতা আল্লাহর ক্রোধের কারণ হবে এবং এ থেকে সৃষ্টি হবে উম্মাহের মধ্যে বিশৃঙ্খলা। আর আমাদের সময়ে এই উম্মাত চারটি মাত্র মাজহাব তথা আহনাফ, মালিকিয়্যা, শাওয়াফী, ও হাম্বালিয়া এর মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে। আর এর বাইরে যাকিছু এখন আছে তারা হচ্ছে বিদআতী ও দুর্নীতিবাজ দল। তাদের শেষ ঠিকানা জাহান্নাম!” [খ.৪, পৃ. ১৫৩]

মওদুদীর দল হলো [দ্বীনি ব্যাপারে] মুক্তচিন্তাবাদী। তারা চার মাজহাবের কোনোটাকেই মানে না। তাদের মতে তাক্বলিদের কোনো জরুরত নেই।

আজকের যুগের গায়র মুক্বাল্লিদরা, তাদের লেবাস ও দাবি যা-ই থাকুক না কোনো একটি একক দল। তারা কোনো মাজহাবের অন্তর্ভুক্ত নয়।

দলিল ২

সায়্যিদুত তা'য়িফাহ আল্লামা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এদের এক প্রশ্নের জবাবে তাঁর প্রণীত ‘সাবীলুর রাশাদ’ গ্রন্থে লিখেছেন:

“গায়র মুক্বাল্লিদরা দাবি করেছে যে, আহলে হাদিস হলো আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং তাদের রাস্তার অনুসরণ জরুরী। তাদের বিরোধী সকল মাসাঈল উপেক্ষা করতে হবে এবং মক্কা শরীফের চার মুসাল্লা হচ্ছে বিদআত। আমরা মুহাম্মদী এবং মুয়াহহিদ, হানাফি, মালিকী বা অন্য কিছু নয়।

জবাব: “সকল এবং বিবিধ ব্যক্তি এ ব্যাপারে স্পষ্ট যে, চার মাজহাবের সকল ফুক্বাহা ও মুহাদ্দিসীনে কিরামের আমল সম্পূর্ণরূপে কুরআন ও হাদিস মুতাবিক। একই বিষয়ে বিভিন্ন রিওয়ায়েতের ক্ষেত্রে কেউ কেউ হয়তো একটির প্রতি আস্থাশীল আর অপরটির প্রতি নন। চারটি মাজহাবই ১০০% কুরআন ও সুন্নাহের উপর ভিত্তিশীল। এটা সর্বদাই আমাদের

অবস্থান ছিলো যে, হাদিস বিরোধী কোনো মতামতকে আমরা গ্রহণ করবো না। এই ইলম ও আমলের সিলসিলা আমাদেরকে সাহাবায়ে কিরাম ও অবশেষে স্বয়ং রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত নিয়ে গেছে। এটা হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের শক্ত শিকল যা কখনও ভাঙ্গা যাবে না।

যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করলেন: ফিরক্বায়ে নাযিয়্যাহ [নাযাতপ্রাপ্ত দল] কোন্‌টি? তিনি জবাব দিলেন: "যারা আমি এবং আমার সাহাবায়ে কিরামের রাস্তার উপর প্রতিষ্ঠিত আছে।"

নতুনভাবে প্রকাশিত দল যারা নিজেদেরকে 'আহলে হাদিস' বলে সম্বোধন করে, অথচ বিরোধিতা করে অনুগ্রহপ্রাপ্ত মহাত্মন সালাফে সালিহীনদের, তাদের আলোচনায় ফিরে আসছি। তারা একটি সম্পূর্ণ নতুন রাস্তার ওপর আছে যার কোনো সূচনাবিন্দু নেই। তাদের সকল দাবি মূলত ভিত্তিহীন। এসব দাবী হলো দ্বীন এবং শরীয়ত সম্পর্কে তাদের অপর্যাপ্ত বুঝ ও অজ্ঞতার কারণ। তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভূক্ত নয়। তারা হচ্ছে আহলুল হাওয়া' [মুক্তচিন্তাবিদ ও নফসের অনুসারী]।" [তা'লিফাতে রাশীদ, পৃ. ৫১৬]

হযরত গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সমগ্র মুসলিম বিশ্বের জন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের একজন ইমাম ছিলেন। তাঁর কথার ওজন আহলে ইলম ও যারা দ্বীনের ওপর ওয়াকিফহাল তাদের নিকট বিরাট।

দলিল ৩

গায়র মুক্বাল্লিদদের ব্যাপারে ফাতওয়ায়ে জামিউস শাওয়াহিদে নিম্নলিখিত কথাগুলো লিপিবদ্ধ আছে। এই ফাতওয়ায় স্বাক্ষর করেন যুগের শ্রেষ্ঠ কয়েকজন উলামায়ে কিরাম। তাঁরা হলেন:

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব নানুতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

আল্লামা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

মুফতি আজিজুর রহমান উসমানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

“নতুন এই [গায়র মুক্বাল্লিদ] দলের আক্বাঈদ [বিশ্বাস] সালাফে সালিহীন ও জমহুর আহলে সুন্নাতের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সুতরাং এদেরকে ‘আহলে বিদআত’ হিসাবে চিহ্নিত করা হবে। ... তারা বিশ্বাস করে তাযসিম ও জিহাতে[১৩] যা সুস্পষ্ট কুফরি ও ফিস্‌ক। তাদের নামায, বিবাহ ও পশু জবাইয়ের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা দরকার যেভাবে আমরা সতর্ক থাকি রাওয়াফিজ ও খারিজীদের ব্যাপারে।”

দলিল ৪

‘মিয়া’তা দুরুস’ কিতাবে হযরত আশরাফ আলী থানবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন:

“পাঠ ৯৫: আমাদের যুগে বেশ ক’টি নতুন মাজাহিব আত্মপ্রকাশ করেছে। এরা দাবি করে তারা হাক্ব। আহলে সুন্নাতের ইজমা’ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে সকলেই [মুসলমান] চার মাজহাবের যে কোনো একটির অনুসারী। গায়র মুক্বাল্লিদরা মুক্ত-চিন্তাবিদ এবং তারা অনুসরণ করে নিজেদের ইচ্ছার। হাদিসের অনুসারী হওয়ার তাদের দাবি ভ্রান্ত। তারা আহলুল হাদিস নয়, যদিও তারা এই নামটি নিজেদের জন্য বেছে নিয়েছে। তারা মূলত একটি অজ্ঞ দল যারা অজ্ঞদের নেতৃত্ব দেয়, যদিও তাদের বাহ্যিক লেবাস-পরিচ্ছেদে ধারণা হয় তারা বিরাট বিরাট স্কলার! মূলত এদের চেহারা, কাজ ও বিশ্বাস অনেকটাই রাওয়াফিজ ও মুতাযিলাদের মতো। সুতরাং এদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো! সতর্ক থাকো!”

[১৩]অর্থাৎ, তারা বিশ্বাস করে মানুষের মতো আল্লাহর বাস্তব দেহ আছে (নাউযুবিল্লাহ!)।

আহলে সুন্নাতের ইজমা'র কর্তৃত্ব

ইজমা'র ক্ষেত্রে যে কোনো অমুক, তমুক সকল ব্যক্তির মতামত বিবেচনায় নেওয়া হয় না। শুধুমাত্র উচ্চ পর্যায়ের বিজ্ঞ উলামায়ে কিরামের মতামত গণ্য হয়। এরপর যে কেউ ইচ্ছেমতো যে কোনো পথের অনুসারী হতে পারে। আহলে বাতিলের ইত্তিফাক্ব ও ইখতিলাফ [মত, মতপার্থক্য ও বিরোধিতা] নিয়ে মাথা ঘামানো মূল্যহীন। তারা চিল্লাচিল্লি ও চেঁচামেচি করতে থাকুক, তাতে কিছু আসে যায় না।

ঠিক যেভাবে 'সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রের' ক্ষেত্রে ইবনে হাজম মতামত দিয়েছিলেন, এগুলো বৈধ। অথচ উম্মতের ইজমা' হলো এগুলো বৈধ নয়। তার ইখতিলাফে কিছুই যায় আসে না। 'সারী ফয়সালা' কিতাবে নিচের কথাগুলো লিখিত আছে:

"ইবনে হাজমের মতামত ধর্তব্য নয়। তিনি হচ্ছেন জাহিরী ফিরক্বার লোক, আহলে সুন্নাহের অন্তর্ভূক্ত নন।" [পৃ. ৯৪]

হযরত থানবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর কিতাবে আমাদের যুগের চারটি গোমরাহ দলের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো সবই 'আহলুল হাওয়া' এর অন্তর্ভূক্ত। এ চারটি দল হলো:

১. গায়র মুক্বাল্লিদ [আহলে হাদিস, সালাফি, মওদুদী, নজদি-ওয়াহাবী]

২. রেজাখানী বিদআতী

৩. রাফিজী শিয়া

৪. আধুনিকতাবাদী।

আমাদের এদের তৎপরতার ব্যাপারে সকর্ত থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা সকলকে শয়তানের প্ররোচণা থেকে রক্ষা করুন।

দলিল ৫

'ইমদাদুল ফাতওয়া' কিতাবে নিচের কথাগুলো লিপিবদ্ধ হয়েছে:

"এদের একদলের আক্বাঈদ [বিশ্বাস] আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। উম্মতের ইজমা' ও জমহুর উলামার বিরুদ্ধে তারা বেশিদূর অগ্রসর হয়ে গেছে। এই দলটি আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত নয়। তারা গোমরাহ। এদের অনুসরণ বৈধ নয়।" [খণ্ড ৪, পৃ. ৪৯৩]

দলিল ৬

নিচের কথাগুলোও উক্ত ইমদাদুল ফাতওয়া কিতাবে লিখিত আছে। প্রশ্ন নং ৫৮২ এর উত্তরে বলা হয়েছে:

"গায়র মুক্বাল্লিদদের সঙ্গে আমাদের মতপার্থক্য শুধুমাত্র কিছু সম্পূরক মাসাঈলের ক্ষেত্রে নয়। এরূপ মতপার্থক্য মুসলমানদের মধ্যে থাকতেই পারে। আর এজন্য কখনও অভ্যন্তরীণ কোন্দল হয় নি, কিংবা রক্ত ঝরে নি।

তাদের সঙ্গে যেসব মতপার্থক্য খুব বেশি মারাত্মক তাহলো দ্বীনের উসূল [মূলতত্ত্ব] সম্পর্কিত। এর মধ্যে একটি হলো আমাদের মহাত্মন পূর্বসূরি আহলুল্লাহদের [সালাফ] প্রতি তাদের অসম্মান পোষণ।[14] এ ক্ষেত্রে এমনকি সাহাবায়ে কিরামদেরও তারা ছাড় দেয় নি। তারা উম্মতের ইজমা' মানে না এবং উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে 'বিদআতী' হিসাবে চিহ্নিত করার সাহস দেখিয়েছে [নাউযুবিল্লাহ!]।

তারা নিজেদেরকে 'মাওয়াহহিদ' বলে এবং মুসলমানদেরকে মুশরিক বলে আখ্যায়িত করে। তারা তাক্বলিদকে একটি জাহিলী প্রথা বলে বিবেচনা করে এবং ভুল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের এসব বাতিল মতামত প্রমাণ করতে তৎপর। তারা 'ফিক্হ' শাস্ত্রকে দালালাত ইত্যাদি বলে। এভাবে তারা মু'মিনদের মধ্যে সৃষ্টি করেছে বিরাট ক্ষতিকারক উপাদান ও বিশৃঙ্খলা। তারা মুসলমানদের ইমামদের বিরোধিতা করে যাচ্ছে। খিলাফত ধ্বংসের একটি বড়ো কারণও তারা। তাদের মারাত্মক আক্বাঈদের মধ্যে একটি হচ্ছে ইসতিওয়া সম্পর্কিত তাদের বিশ্বাস: তারা

---

[14]আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এই লোকগুলো আবার নিজেদেরকে 'সালাফি' অর্থাৎ পূর্বসূরিদের অনুসারী বলে দাবি করে!

বলে, আল্লাহ তা'আলা আরশে বসে আছেন এবং তাঁর পা কুরসির ওপর আছে! [সূত্র: শরঈ ফয়সালা, পৃ. ৪৫০ এবং রিসালা ইসতিওয়া আলা মাস'আসা ইসতিওয়া]। এই বাতিল দল আল্লাহ তা'আলাকে জাহিলী যুগের মূর্তির সমপর্যায়ে নিয়ে গেছে! নাউযুবিল্লাহ! তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে বের হয়ে গেছে। এখন তারা তাদের একক রাস্তার ওপর আছে। ইসলামের সর্বোত্তম যুগ তথা ১ম হিজরী শতকের সাহাবায়ে কিরাম ও আহলে সুন্নাতের ইমামদের থেকে অনেক অনেক দূরে অবস্থান করছে। তারা একটি বিভ্রান্ত দল যাদের উৎপত্তিস্থল সন্দেহবাদ। এরা একটি বক্র দল। তারা উম্মতের মধ্যে মতানৈক্য ও বিভ্রান্তির বীজ বপন করে যাচ্ছে।" [ইমদাদুল ফাতওয়াহ, খণ্ড ৪, পৃ. ৫৬২]

দলিল ৭

দারুল উলূম দেওবন্দের শতবার্ষিক জলসার পরামর্শসভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, শুধুমাত্র আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের উলামাদের নিমন্ত্রণ করা হবে। ফিরক্বায়ে বাতিলদের কাউকে ডাকা হবে না। সভায় প্রথম প্রশ্নই ছিলো, গায়র মুক্বাল্লিদদের নিয়ে। দারুল উলূমের সকল আসাতিজায়ে কিরাম ও আরাকীনে কিরাম মতৈক্যে পৌঁছুয়েছিলেন যে, এই দলটি আমাদের তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং কোনো গায়র মুক্বাল্লিদ আলিমকে ঐ জলসায় দাওয়াত করা হয় নি।

এরপর মিস্টার মওদুদীর 'উম্মাত' সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠলো। শূরা এদের ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নিলেন, দাওয়াত দেওয়া হবে না।

দলিল ৮

গায়র মুক্বাল্লিদরা নিজেদের পরিচিতির জন্য 'আহলে হাদিস' নামটি পছন্দ করেছে। এই নামটির ওপর কিছুটা গভীরে যেয়ে আলোচনা করে দেখা যাক, 'আহলে হাদিস' 'আসলে সুন্নাত' কি না?

সুন্নাতের অর্থ: 'আত্‌তারিকাতুল মাসলূকাহ ফিদ্বীন' - দ্বীনের অনুসরণীয় / গৃহীত রাস্তা।'

হাদিসের অর্থ: 'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, আমল ও আমলের সমর্থন এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা।' যাকিছু শুধুমাত্র রাসূলের জন্য খাস তা-ও হাদিসের মধ্যে বর্ণিত আছে। এছাড়া হাদিসে বর্ণিত আছে ওসব বিষয় যা মাওওয়াল (ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা সম্বলিত) এবং ওসব বিষয় যা পরবর্তীতে মানসূখ (রহিত) হয়েছে।

প্রত্যেক হাদিস সুন্নাত নয় কিন্তু প্রত্যেক সুন্নাত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

অনুরূপ, খুলাফায়ে রাশিদীনের নির্দেশ ও আমলও সুন্নাত, যদিও এদেরকে রাসূলের হাদিস হিসাবে বলা না হয়, যেমন: তারাবীর নামাযে ২০ রাকাআত।

ওসব হাদিস যেগুলো আমল হিসাবে গৃহীত হয়েছে তা সবই সুন্নাত। অপরদিকে প্রত্যেক হাদিসই সুন্নাত নয়। কিছু হাদিস আছে যেগুলো হতে পারে খাস, মাওওয়াল কিংবা মানসূখ (বিশেষ ঘটনা বা অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ, ব্যাখ্যাকৃত কিংবা রহিত)। কিছু আমল [রাসূলের] হাদিস থেকে প্রতিষ্ঠিত না-ও হতে পারে, কিন্তু এগুলোও সুন্নাত হিসাবে বিবেচিত হবে, যেমন: জুমু'আর দ্বিতীয় আযান।

হাদিসে আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সুন্নাতের ওপর দৃঢ় থাকতে:

"যে আমার সুন্নাতের ওপর দৃঢ় থাকে ফিতনার যুগে, সে ১০০ শহীদের সাওয়াব পাবে।" [মিশকাত : হা.নং. ১৭৬]

"আমি দু'টি জিনিষ রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এগুলোকে ধরে রাখবে, তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। এ দু'টো হলো: আল্লাহর কিতাব [কুরআন] ও সুন্নাতে রাসূলিল্লাহ।" [মিশকাত : হা,নং. ১৮৬]

"তিনটি জিনিসে ইলম আছে: কুরআনের মুহকাম আয়াত, রাসূলের প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত এবং ফরাঈযের বিজ্ঞান। বাকি সবই মাধ্যমিক।" [মিশকাত : হাদিস নং. ২৩৯]

অন্য আরেক হাদিসে হাদিসের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে:

"আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে সম্মানে ভূষিত করুন, যে আমার হাদিস শ্রবণ করে ও তা রক্ষা করে ..."

উম্মাতের 'সাওয়াদে আজম' [বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ দল] সর্বোত্তম যুগসমূহ থেকেই 'আহলুস সুন্নাত' হিসাবে পরিচিত হয়ে আসছেন, কখনও নতুন আবিষ্কৃত 'আহলে হাদিস' নয়। স্ব-ঘোষিত 'আহলে হাদিস' কখনও 'আহলে সুন্নাত' নয়। আর বাস্তবে তারা 'আহলে হাদিস'ও নয়। তাদের কর্তৃক এই নামটির ব্যবহার হচ্ছে প্রতারণামূলক ও ভ্রান্তিজনক।

আহলে সুন্নাতের মাজহাব কুরআন, হাদিস ও উম্মাতের ইজমা' দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তাদের পদ্ধতি যুগ যুগ ধরে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের মাধ্যমে চলে আসছে।

'আক্বদুল জায়্যিদ' কিতাবে শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইজমা' ও সাহাবায়ে কিরামের আমলকে দ্বীন হিসাবে মানে না, তাদের সম্পর্কে ব্যাখ্য দিয়েছেন যা আমরা ইতোমধ্যে তুলে ধরেছি।

শাহ সাহেব তাঁর 'আল-ক্বওউলুল জামিল' কিতাবে মুসলমানদেরকে এদের সঙ্গে মেলামেশায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুমের উচ্চ মর্যাদা

সাহাবায়ে কিরাম হচ্ছেন সত্যের মাপকাঠি

(হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির 'ওয়াসিআ'হ', খ.২, পৃ. ৫৯ থেকে)

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত সকল আম্বিয়ায়ে কিরামকে তাঁদের জাতির নিকট পাঠানো হয়। বুখারী শরীফে বর্ণিত একটি হাদিসে আছে:

"(আগের) আম্বিয়াগণ যার তার জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে গোটা মানবজাতির প্রতি।"

ঐ সময় পর্যন্ত নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা বিদ্যমান ছিলো। প্রত্যেক নবী নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা হিসাবে তাঁর পূর্ববর্তী নবীর স্থলাভিষিক্ত

হতেন। ঐ সময় কোনো উম্মতই মাব'ঊত [আল্লাহ কর্তৃক বিশেষভাবে প্রেরিত ও প্রতিনিধি] হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন নি। এই দায়িত্ব একমাত্র আম্বিয়ায়ে কিরামের জন্য খাস ছিলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন খাতামুল আম্বিয়া - আম্বিয়াদের মধ্যে সর্বশেষ। আর এ কারণেই তাঁর উম্মতকে মাব'ঊত হওয়ার মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে! সহীহাইনে[১৫] এ সম্পর্কিত একটি হাদিস আছে:

"আম্বিয়াগণ [আলাইহিমুস্‌সালাম] বনী ইসরাঈলের ব্যাপার পরিচালনা করতেন। প্রত্যেক সময় কোনো নবীর প্রস্থানের পর আরেকজন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পরে অবশ্যই আর কোনো (নতুন) নবীর আগমন ঘটবে না (শূন্যস্থান পরিপূর্ণ করতে)।"

অন্য কথায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর তাঁর উম্মতই রিসালাতের দায়িত্ব স্থায়ীভাবে পালন করে যাবেন।

একদল বিশেষ ব্যক্তি আছেন যাদেরকে 'মুতহামীন' বলে। এ ব্যক্তিদেরকে সরাসরি আল্লাহ তা'আলা শিক্ষাদীক্ষা ও প্রতিপালন করেন। আর এদের মধ্যেও আবার বেশ কটি স্তর আছে।[১৬] ইতিহাসের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সকল স্তরের একমাত্র জামি' (সমেত) ব্যক্তি। অন্য কোনো নবী বা ফিরিশতা এই স্তরে উন্নীত হন নি। এ কারণেই একমাত্র সায়্যিদিনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সেরা ছিলেন। এ কারণেই তিনি আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন।

এই বি'তাত [রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিশনকে কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত রাখার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য উম্মতকে প্রেরণ / নির্বাচন করা] দ্বিতীয় বি'তাত বা রাসূলের বি'তাতকে অব্যাহত রাখার মতো।

---

[১৫]বুখারী ও মুসলিম শরীফ।

[১৬]সর্বমোট ৮টি স্তর আছে। বিস্তারিত জানতে পাঠ করুন, রাহমাতুল্লাহি ওয়াসিআ'হ, খ. ২, পৃ. ৪৬।

শাহ সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর সমর্থনে তিনটি দলিল পেশ করেছেন:

দলিল ১

কুরআনের আয়াত:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।" [সূরা সাবা : ২৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত আরব-অনারব নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু, আল্লাহর বাণীকে এক ব্যক্তির পক্ষে [ক্বিয়ামত পর্যন্ত] প্রচার করা তো আর সম্ভব নয়।

সুতরাং রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বি'তাতকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করা হয়:

১. তাঁর জীবদ্দশায় সরাসরি আরবদের প্রতি দাওয়াত পৌঁছুনো।

২. তাঁর ইন্তিকালের পর সাহাবায়ে কিরামের প্রচেষ্টা সমগ্র মানবজাতির প্রতি।

সাহাবারাই ছিলেন এ উম্মতের প্রথম দল, সুতরাং তাঁরা হচ্ছেন রাসূলের প্রতিনিধি। এটাই ছিলো তাঁদের বি'তাত। আর একদিকে এটা ছিলো স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বি'তাতের অনুবর্তন।

সূরা জুমু'আর ২ থেকে ৪ নং আয়াতমালায় আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতকে দু'টি দলে বিভক্তির কথা উল্লেখ করেছেন:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ*

وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ*
ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

"তিনিই নিরক্ষরদের [আরবদের] মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ [কুরআন], তাদেরকে [আধ্যাত্মিকভাবে] পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমাত [সুন্নাত]। ইতিপূর্বে [রাসূলের আগমনের পূর্বে] তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় [ভুলের মধ্যে] লিপ্ত।

এই রাসূল প্রেরিত হয়েছেন [রাসূল হিসাবে] অন্য আরও লোকদের জন্যে, যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয় নি [অচিরেই হবে)। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

এটা আল্লাহর কৃপা, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন [পথনির্দেশনা, আরব-অনারব সবাইকে]। আল্লাহ মহাকৃপাশীল।" [সূরা জুমু'আ : ২-৪]

উক্ত আয়াতমালার শুরুতে আরবদের 'উম্মী' [নিরক্ষর] বলে ডাকা হয়েছে। এটা ঐ যুগের আরবদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, যাদের অধিকাংশই ছিলেন ইসমাঈল আলাইহিস্‌সালামের বংশধর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সরাসরি এই আরবদের মধ্যেই প্রেরণ করা হয়েছিল বলে তাঁকেও 'নাবিয়্যিল উম্মী' [উম্মীদের নবী] বলে সম্বোধন করা হয়েছে। [সূরা আ'রাফ : ১৫৭-১৫৮] এই একই নাম তাওরাত ও ইঞ্জিলে উল্লেখিত হয়েছে। এরাই [অর্থাৎ আরবরা] হচ্ছেন উম্মতের প্রথম দল।

'আখারীন' (অন্যরা) বলতে সে যুগের পরবর্তী সকল যুগের আরব-অনারব মুসলমানদের কথা উদ্দেশ্য। এদের আগমন পুরো পৃথিবীব্যাপী কিয়ামত পর্যন্ত ঘটবে।

'ওয়া' অব্যয়ের মাধ্যমে উভয় শব্দ একত্রিত করা হয়েছে। এটা এসেছে ইত্তিহাদ ও মুগ্বাইয়্যারাত [অর্থাৎ এটা উদ্দেশ্যের এককত্ব ছাড়াও ভিন্নতার দিকে ইশারা করছে] এর উদ্দেশ্যে।

‘ইত্তিহাদ’ হচ্ছে এটি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রেরিত সর্বশেষ নবী।

‘মুগ্বাইয়্যারাত’ হচ্ছে যে, তাঁর সময়ের আরবদের প্রতি প্রত্যক্ষভাবে তাঁকে সরাসরি প্রেরণ করা হয়েছিল। আর পরোক্ষভাবে তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন বাকি সবের প্রতি- অর্থাৎ, তাঁর প্রতিনিধি আসহাবে কিরামের মাধ্যমে।

পরের আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

“তিনি যাকে ইচ্ছা নিজের বিশেষ অনুগ্রহ (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) দান করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।” [সূরা হাদীদ : ২৯]

এ আয়াতের প্রথমাংশ ইঙ্গিত করে যে, মানবজাতির সবাই তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করবে না। কিন্তু এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে দানশীলতার কমতি থেকে হবে না। কারণ তিনি হচ্ছেন: ‘মহা অনুগ্রহশীল’।

দলিল ২

কুরআনের আয়াত:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“তোমরাই [মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীরা] হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। আর আহলে- কিতাবরা যদি ঈমান আনতো, তাহলে তা তাদের জন্য মঙ্গলকর হতো। তাদের মধ্যে

কিছু তো রয়েছে ঈমানদার আর অধিকাংশই হলো পাপাচারী”। [সূরা আলে ইমরান : ১১০]

এই আয়াত সম্পর্কে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর তিনটি বক্তব্য পাওয়া যায়।

ইবনে জরীর তাবারী ও ইবনে আবি হাতিম, তাবিঈ হযরত সুদ্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন:

১. “আল্লাহর ইচ্ছা হলে তিনি বলতে পারতেন ‘আনতুম’ - তখন এই আয়াতের সদ্‌গুণে সকল মু’মিনরা সম্পৃক্ত হতেন। কিন্তু আল্লাহ বলেছেন, ‘কুনমুত’ - সুতরাং আয়াতের সদ্‌গুণ তাই নির্দিষ্ট হয়েছে বিশেষভাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীদের মধ্যে। তাঁদের পরে যে কেউ তাঁদের রাস্তা অনুসরণ করবে সেই হ-বে ‘সর্বোত্তম উম্মত’।”

২. “এই মর্যাদা উম্মতের প্রথম দল ও এর শেষের অংশের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে।”

৩. ইবনে জরীর তাবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আবু ক্বাতাদাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, “উমর রা. একদা এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন। এরপর বললেন, হে লোকসকল! যে কেউ এই আয়াতে উল্লেখিত সদ্‌গুণের অংশীদার হতে চাও, তাকে এতে বর্ণিত শর্তটি পরিপূর্ণ করতে হবে।”

উপরোক্ত তিনটি বর্ণনা কানযুল উম্মাল [খ. ২, পৃ. ৩৭৫-৩৭৬] গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রথম ও তৃতীয়টি লিপিবদ্ধ হয়েছে হায়াতুস সাহাবা [খ. ১, পৃ. ১৭] গ্রন্থে।

আরবি ব্যাকরণ [নাহু] মুতাবিক ‘আনতুম খাইরা উম্মাহ’ হচ্ছে ‘জুমলাহ ইসমিয়্যা খাবরিয়্যাহ’ [নামবাচক তথ্যমূলক বাক্য]। এটা আসে কোনো বিষয়কে ‘তাবূত’ ও ‘ইসতিমরার’ [সাধারণ হিসাবে ও একটানাভাবে প্রমাণ] করতে। যেমন ‘জাইদুন ক্বায়িমুন’ - জায়িদ দাঁড়ানো আছে। এখানে সময় ও স্থান উল্লেখিত হয় নি।

অপরদিকে 'কুনতুম খাইরা উম্মাহ' এর 'কুনতুম' (তোমরা) হলো 'দ্বামির কা-না' এর ইস্‌ম। আর 'খাইরা উম্মাহ' হলো 'কা-না'র খবর। এ ধরনের বাক্যের অর্থ সীমিত। অর্থাৎ এটার অর্থ সাধারণ বা একটানাভাবে হবে না।

উপরোক্ত আলোচনার সারমর্ম হলো, এই আয়াতটি বিশেষভাবে সাহাবায়ে কিরামকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, 'তোমরা (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীগণ) হলে শ্রেষ্ঠ উম্মত। এই জ্ঞানের বহনকারী তোমরা যার দ্বারা মানুষের উপকার সাধন করবে। তাদেরকে দেখাবে ন্যায়নিষ্ঠ রাস্তা। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার্থী হিসাবে এটা তোমাদের দায়িত্ব যে, প্রথম উম্মত হয়ে তোমরা দ্বীনের দাওয়াত পুরো পৃথিবীব্যাপী নিয়ে যাবে। মানুষকে তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং তাদেরকে ঈমান গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাবে। 'আহলে কিতাব'গণ এই 'খাইরুল উম্মাহ'র অন্তর্ভূক্ত নয়, যদিও তারা [ঐ সময়] মদিনায় বসবাস করতো। তবে তাদের যারা ঈমান এনেছে তা তো তোমাদেরই সঙ্গী হয়ে গেলো। কিন্তু এদের অধিকাংশ ঈমান আনবে না।'

এখন, এটা আবশ্যিক ও আমাদের ঈমানের অঙ্গ হিসাবে বিশ্বাস রাখা যে, নবী হচ্ছেন মা'সূম (বেগুনাহ)। এর ফলে আমরা নবী ও তাঁর দাওয়াতের ওপর আমাদের পূর্ণাঙ্গ আস্থা [ই'তিমাদ] রাখতে পরি। অনুরূপভাবে এটা আবশ্যিক যে, সাহাবায়ে কিরামদের হতে হবে মাহফূজ [নিরাপত্তাপ্রাপ্ত] কারণ তাঁরাও হচ্ছেন মাব'ঊত [প্রেরিত বা নির্বাচিত]। তাঁরাই হচ্ছেন রাসূল ও পরবর্তী উম্মতের মধ্যমণি।

তাঁদের আদালত [বিচার ও মর্যাদা] প্রতিষ্ঠিত হতেই হবে, আমরা যদি তাঁদের দ্বারা প্রচারিত সবকিছু গ্রহণ করতে রাজি হই; এবং তা-ই আমরা লক্ষ্য করি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাঁর আসহাবের প্রতি সমর্থনমূলক বাণীতে:

"আমার সকল সাহাবা হচ্ছেন 'আদূল' [সত্য ও বিশ্বাসযোগ্যতার সর্বোচ্চ স্তরে]।"

এবং

“আমার সাহাবারা আকাশের পথনির্দেশক তারকাদের মতো। যাকেই তোমরা অনুসরণ করবে, হিদায়াত লাভ করবে।”

মানবজাতির জন্য ‘পথনির্দেশক’ হওয়ার মর্যাদায় ভূষিত হওয়া এবং একই সময় তাঁরা নিজেরাও সঠিক রাস্তায় প্রতিষ্ঠিত থাকার নিশ্চয়তা লাভ, একমাত্র মহাত্মন একদল আসহাবে কিরাম রিদ্বওয়ানুল্লাহি তা’আলা আজমাঈনের ভাগ্যে জুটেছিল।

এই ‘আদালত’ ও ‘হিফাজত’ হচ্ছে সাহাবায়ে কিরাম ‘মিয়ারে হাক্ব’ [সত্যের মাপকাঠি] হওয়ার বুনিয়াদ। যা তাঁরা আমাদের নিকট পৌছুয়েছেন তাহলো ‘দ্বীন’ এবং যা তাঁরা বলেছেন ও করেছেন তাহলো সত্য ও ‘সুন্নাহ’। তাঁদের ‘তাক্বলিদ’ উম্মাহর জন্য শর্ত। [অন্যথায় সঠিক এবং হাক্ব দ্বীন ও আমল পাওয়া যাবে না- অনুবাদক]

তবে কিছু দুর্ভাগা লোক আছে যারা উক্ত শর্ত মানে না। তাদের চিন্তা করা উচিত, যা কিছুই তারা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পেয়েছে তা সবই এসেছে সাহাবায়ে কিরামের মাধ্যমে। তাঁদের প্রতি যদি ‘ই’তিমাদ’ না থাকে তাহলে, তাঁরা যাকিছু সরবরাহ করলেন তার মূল্য কী আর থাকলো?

মুসলমানদের মধ্যে আসহাবে কিরাম ছিলেন একমাত্র দল যারা একটি গ্রুপ হিসাবে প্রত্যেকেই ছিলেন, নবুওয়াতী কাজের জন্য আল্লাহ তা’আলা কর্তৃক বিশেষভাবে নির্বাচিত। আর এ কারণেই তাঁরা সবাই প্রত্যেক ভুল আক্বীদা [বিশ্বাস] এবং ভুল আমল থেকে ‘মাহফূজ’ ও মা’মূন’ [নিরাপত্তাপ্রাপ্ত]।

দলিল ৩

বুখারী শরীফের একটি রিওয়ায়েতে আছে, একদা এক বেদুঈন মসজিদে নববীর ভেতর প্রস্রাব করে। সাহাবায়ে কিরাম ছেয়েছিলেন তাকে পাড়কাও করতে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “একে ছেড়ে দাও। যখন সে শেষ করবে, কয়েক বালতি পানি দ্বারা [প্রস্রাব] ধুঁয়ে নেবে … ” এরপর তিনি আবার বললেন: “ফাইন্নামা

বু'ইত্তুম মুইয়াসসিরীন ওয়ালাম তু'আতূ মু'আসসিরীন"। অর্থাৎ, তোমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে শান্তির রাস্তা প্রদর্শনের জন্য এবং কোনো ব্যাপার কঠিন করার জন্য নয়।" [বুখারী, কিতাবুল উযু, হা. নং. ২২০, মিশকাত, হা. নং. ৪৯১]

উক্ত হাদিসে 'বা'আতা' শব্দটি স্পষ্টভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লামা সিন্ধী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর শরায় লিখেছেন: "এই হাদিস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে উম্মত [আসহাবে কিরাম] হচ্ছেন 'মান'ঊত' [প্রেরিত]। এতে এটাই প্রতিষ্ঠিত হলো যে, রাসূলের জন্য দ্বিতীয় একটি প্রেরিত দল এসেছিলেন।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন আম্বিয়াদের মধ্যে সর্বশেষ। আর কোনো নতুন নবী বা রাসূল আসবেন না। এ কারণে রাসূলের কাজকে অব্যাহত রাখতে তাঁর উম্মতকে নির্বাচিত করা হয়েছে। রাসূলের কাজ ও শিক্ষা হলো তাঁরই কামালাত [আদর্শিক সিদ্ধি]। নবুওয়াত পরিপূর্ণ হয়েছে ঠিকই কিন্তু নবীর কামালাত সর্বদাই নূরান্বিত থাকবে। হ্যাঁ, খতমে নবুওয়াতের কারণে কোনো ব্যক্তি কোনোদিন নবুওয়াতের দাবি তুলতে পারবে না। এরূপ ব্যক্তিকে 'দজ্জাল' [পথভ্রষ্ট] হিসাবে আখ্যায়িত করা হবে।

একটি হাদিসের ইসতিনাদ (বিশ্লেষণ)

হাদিস: "আমার সাহাবারা পথনির্দেশক তারাদের মতো। তোমরা যাকেই অনুসরণ করবে, হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে।"

এই হাদিসটি ছ'জন ভিন্ন সাহাবায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত হয়েছে:

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

২. হযরত জাবির রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

৩. হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

৪. হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

৫. হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

এটি হযরত দাহহাক্ব ইবনে মুজাহিম হিলালীও ‘মুরসাল’ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

১. ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বর্ণনা:

এই সনদে হামযা ইবনে আবি হামযা জাযরী একজন দূর্বল বর্ণনাকারী। তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন মুহাদ্দিসীনে কিরামের মতামত হলো:

- ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মা’ঈম বলেন: তার মূল্য এক পয়সাও নয়!

- ইমাম বুখারী বলেন: তিনি মুনকারুল হাদিস [হাদিস প্রত্যাখ্যানকারী]।

- দারে কুতনী বলেন: তিনি মাতরুক [বর্জনীয়]।

- ইবনে আদি বলেন: তার বর্ণনার অধিকাংশই মাতরুক।

- ইমাম তিরমিযী তাঁর একটি বর্ণনার উল্লেখ করেছেন। এরপর বলেছেন: এই হাদিস মুনকার। হামযা হাদিসে জঈফ। [তুহফাতুল আহওয়াজ, খ.৩, পৃ. ৩৯১]

সিদ্ধান্ত: এই রাবী জঈফ জিদ্দান [খুব দুর্বল]।

২. হযরত জাবির রাদ্বিআল্লাহু আনহুর রিওয়ায়েত:

এই সনদ সম্পর্কে মতামত:

- দারে কুতনী বলেন: এই রিওয়ায়েত মালিক থেকে প্রমাণিত নয়। এর বর্ণনাকারীরা মাজহূল [অজানা]। [লিসান]

- হাফিজ বলেন: জামিল মা’রূফ [জানা] নন। [তালখিস]

- আবু হাতিম রাজী বলেন: লা আ’রিফুহূ [অজানা]। [লিসান]

আল্লামা ইবনে আবদিল বার 'জামি' বাইয়্যানি ইল্‌ম' গ্রন্থে নিজের সনদে এই বর্ণনাটি দিয়েছেন। কিন্তু এরপর তিনিই বলেন, এই সনদটি হুজ্জাত হিসাবে ব্যবহারের জন্য শক্ত নয় কারণ, হারিস ইবনে গাদিন হলেন মাজহূল [অজানা]।

লিসানুল মিযানে হাফিজ উক্ত আল্লামা ইবনে বারের মন্তব্য উল্লেখ করে বলেছেন:

- তুসি তাঁকে [গাদিনকে] 'তাযকিরাহ রিজালুশ শি'আহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

- ইবনে হিব্বান তাঁর 'কিতাবুত তিক্বাত' গ্রন্থে তাঁর [গাদিনের] কথা উল্লেখ করেছেন।

সিদ্ধান্ত: রিওয়ায়েতের মধ্যে সমালোচনামূলক মন্তব্য [জারাহ] খুব মারাত্মক নয়। রাবী (বর্ণনাকারী) হলেন মাজহূদ (অজানা)। কিন্তু দু'টি সনদ [বর্ণনার শিকল] একে অন্যকে শক্তিশালী করেছে। এই তারীক্ব হচ্ছে জঈফ (দুর্বল) কিন্তু জঈফ জিদ্দান নয়।

৩. হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর রিওয়ায়েত:

রাজিনের তারিক্বে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত কথাগুলো আছে:

- মিশকাতের প্রণেতা এই রিওয়ায়েতটি তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

- আবু বকর বায্যারও এটির বর্ণনা দিয়েছেন (তালখীসুল হাবীর, পৃ. ৪০৪ এবং জামি' বাইয়্যানিল ইল্‌ম)।

- ইমাম জাহাবীও এটি তাঁর মিযানুল ই'তিদাল কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।

এই তারিক্বও জঈফ। আবদুর রাহীম সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনে কিরামের মতামত হলো:

- ইমাম বুখারী বলেন: তারাকূহু [মুহাদ্দিসীন তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন]

- ইবনে মা'ঈন বলেন: কাজ্জাব [মিথ্যাবাদী] এবং লিসান বি শাই' [তিনি কিছুই নন]।

- জাওয্জানী বলেন: গায়র তিক্বাহ (নির্ভরযোগ্য নন)।

- আবু হাতিম বলেন: তুরিকা হাদীতুহু [তার বর্ণনাগুলো উপেক্ষিত]।

- আবু জারা'হ বলেন: ওয়াহিন [দুর্বল]।

- আবু দাউদ বলেন: জঈফ [দুর্বল]।

সিদ্ধান্ত: এই রিওয়ায়েতটিও আবদুর রাহীমের কারণে দুর্বল

৪. হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর রিওয়ায়েত:

এই তারিক্বও জঈফ জিদ্দান। জাফর ইবনে আবদিল আহাদ সম্পর্কে মতামত হলো:

- দার কুত্নী বলেন: তিনি হাদিস জাল করেন।

- আবু জারা'হ বলেন: তিনি ভিত্তিহীন হাদিস বর্ণনা করেন।

- ইবনে আদি বলেন: তিনি হাদিস 'চুরি' করেন ও মুনকার হাদিস বর্ণনা করেন।

৫. হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর রিওয়ায়েত:

বায্জার এই হাদিসটির বর্ণনা দিয়েছেন, কিন্তু সেটা ছিলো তালখিসে। হাফিজ বলেন, এর সনদ ভালো নয়।

৬. হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর রিওয়ায়েত:

ইমাম বাইহাকী এটি 'মাদখাল' কিতাবে এবং মানওয়ী এর উল্লেখ করেছেন তাঁর 'ফাইযুল ক্বাদির শরাহ জামিউস সাগীর' নামক কিতাবে। তবে এর সনদ উল্লেখ করেন নি। হাদিসের ওপর কোনো মন্তব্য লিখেন নি।

৭. দাহ্হাক থেকে বর্ণিত মুরসাল হাদিস:

ইবনে হাজর তালখীসে এটি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: "আবু যার হারাওয়ী এটি তাঁর 'কিতাবুস সুন্নাহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এই হাদিসের সনদ জঈফ।"

[শেষ হলো এই হাদিসের সাতটি তারীক্ব]

এই হাদিসটি বেশ কয়েকটি সনদে বর্ণিত হয়েছে। সবগুলো একত্রে বিবেচনা করলে একে জঈফ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। মিশকাতের শরাহ 'আত-তা'লীকুস সাবীহ' কিতাবে এই কথাগুলো লিপিবদ্ধ আছে: "এর সদন দুর্বল। কিন্তু বিভিন্ন সনদ একে অন্যকে সম্পূরক হিসাবে দাঁড় করে। ঠিক এ কথাটিই 'মুখতাসার জুরজানী' কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'জাফারুল আমানী'-তে উল্লেখিত হয়েছে।

অনুরূপ আরেক হাদিস হলো: 'নিম্নতম হায়েজের মাত্রা তিন দিন ও ঊর্ধ্বতম মাত্রা ১০ দিন"। এটাও ৬ জন সাহাবায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত। এর প্রতিটি তারীক্ব খুব দুর্বল। দবে সকল সনদ একত্রিত করার পর এর স্তর জঈফ পর্যায়ে উপনীত হয়।

আহনাফের মতে, একটি জঈফ হাদিস কোনো মুজতাহিদের রায় থেকেও অগ্রাধিকার পাবে। সুতরাং এ ধরনের হাদিস গ্রহণীয়।

আমরা যে হাদিসটির ওপর আলোচনা করছি সেটিও জঈফ স্তরে উন্নীত। আর ফাজাইলের ক্ষেত্রে জঈফ হাদিসও সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণীয়।

ইবনে হাজম জাহিরী বলেছেন: "এই হাদিস মাখজূব মাওজূহ বাতিল"। কিন্তু তার সিদ্ধান্ত বিবেচনার যোগ্য নয়। বায্যার বলেছেন: "এটা সহীহ নয়।" এই সিদ্ধান্ত সঠিক। কারণ, যে হাদিস সহীহ নয় তা জঈফ, কিন্তু বাতিল এবং মাওজূহ অবশ্যই নয়। আর এ উভয় সিদ্ধান্তের মধ্যে আসমান -জমিন পার্থক্য বিদ্যমান!

তবে এই বায্যারই আবার এই হাদিস সম্পর্কে আরেকটি আপত্তি তুলেছেন। তিনি বলেন: "এই হাদিস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহীহ আরেক হাদিসের বিরোধী যেখানে তিনি বলেছেন, 'আমার পর আমার সুন্নাত ও খুলাফায়ে রাশিদীনকে শক্ত করে আকড়ে

ধরো।' এতে প্রমাণিত হয় সাহাবাদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান, আর তা বুঝা যাবে না।"

কিন্তু আল্লামা ইবনে বার এই জবাবটি তুলে ধরেন: "বায্যারের কালামটি সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল নয়। প্রত্যেক সাহাবীই তার নিজের দিক থেকে হাক্ব এর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং তাঁদের সকলেই অনুসরণযোগ্য। আর তাঁদের মধ্যস্থ আভ্যন্তরীণ মতপার্থক্যও উম্মার জন্য দিকনির্দেশনার সূত্র।"

সাধারণত আহনাফগণ যখনই তাঁদের মাজহাবের সমর্থনে কোনো রিওয়ায়েতের আশ্রয় নিয়েছেন যা আসহাবুল হাদিসগণ নেন নি, তখনই দ্বিতীয় দলের সচরাচর যুক্তি হয়ে থাকে: এই রিওয়ায়েত জঈফ বা এটি গায়র মু'তাবার (গ্রহণযোগ্য নয়)। এরূপ অনেক উদাহরণ আছে।

সজোরে হাসির মাধ্যমে অযু ও নামাজ ভঙ্গের মাসআলা; হায়েজের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সময়ের মাত্রা; কিরাতে খালফাল ইমাম ইত্যাদি হচ্ছে অন্যান্য যুক্তিতর্ক। অথচ অধিকাংশ এরূপ মাসাঈলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হাদিস মু'তাবার। আরোও জানতে পাঠ করুন 'ই'লাউস সুনান' কিতাবটি।

আহনাফগণ 'আসহাবী কান নুযূম' হাদিসটি নিজেদের মাজহাবের সমর্থনে ব্যবহার করেন এবং বলেন, সাহাবায়ে কিরামের আক্বওাল ও ফাতওয়া দ্বীনের হুজ্জাত।

আহনাফের মতে, সাহাবাদের বাণী দ্বীনের হুজ্জাত, এমনকি তাঁদের [সাহাবাদের] মধ্যে মতৈক্য না থাকলেও।

অন্যান্য ইমাম শুধুমাত্র সাহাবাদের ইত্তিফাক্ব দ্বীনের হুজ্জাত হিসাবে গ্রহণ করেছেন। একজন মাত্র সাহাবীর আছার [বাণী] এর ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইমামের ইজতিহাদের ওপর নির্ভর করে তিনি তা গ্রহণ, না বর্জন করবেন।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন: "প্রত্যেক সাহাবীকে আলাদাভাবে অনুসরণ জরুরী নয় যদি না তাঁদের মধ্যে এ ব্যাপারে ইত্তিফাক্ব হয়ে থাকে ... " [হুজ্জাতুল্লাহ, পৃ. ১৪৭]।

আহনাফদের মতে যদি কোনো সাহাবীর আছার উপস্থাপন করা হয় তাহলে, মুজতাহিদ নিজের ইজতিহাদ করবেন না।

সুতরাং তাঁদের অভ্যেসানুযী, আসহাবুল হাদিসগণ উক্ত হাদিসকে গায়র মু'তাবার হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো হাফিজ ইবনে হাজর আসক্বালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, একমাত্র ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর রিওয়ায়েত ছাড়া, এই হাদিসের সকল তুরুক্ব সংগ্রহের পর তিনি ইবনে হাজমের ক্বউল (মতামত) এনেছেন! অথচ সাধারণত যেখানেই তাঁর জন্য সুবিধাজনক হয়েছে, সেখানেই তিনি যে কোনো হাদিসের ২ বা ৩টি তুরুক্ব একত্রিত করে বলে থাকেন: "এই ক'টি তুরুক্ব একটা আরেকটাকে শক্তিশালী করেছে। সুতরাং হাদিসটি গ্রহণযোগ্য!' কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি টেবিলটি পুরোদমে পাল্টে দিলেন।

আরো ব্যাপার হলো:

- যদি কোনো হাদিসের মধ্যে অনেকগুলো সদন থাকে যাদের সূত্র একই সাহাবি পর্যন্ত পৌঁছুয়, তাহলে, এটার মধ্যে রিওয়ায়েতের মূল (আছর) থাকায় তা দলিল হিসাবে গণ্য।

- কোনো হাদিসের মধ্যে একাধিক সদন থাকলে এবং এগুলো বিভিন্ন সাহাবা পর্যন্ত পৌঁছুলে ও একই সময় জঈফ (দুর্বল) হলে, এই রিওয়ায়েত হবে হাসান লি গাইরিহি।

- কোনো হাদিসের মধ্যে একাধিক সদন থাকলে এবং এগুলো বিভিন্ন সাহাবা পর্যন্ত পৌঁছুয় ও একই সময় খুব জঈফ হলে, এই রিওয়ায়েত জঈফ বলে গন্য হবে।

উক্ত উসূলসমূহ মনে রেখে আমরা যদি আলোচিত হাদিসটির স্তর বিন্যস্ত করি তাহলে বলতেই হবে, এটি অন্ততপক্ষে একটি জঈফ হাদিস [এর নিচের স্তরে এটি যায় না]।

বাস্তবে মহাত্মন মুল্লা আলী ক্বারী রাহিমাহুল্লাহ এই হাদিসটিকে 'হাসান লি গাইরিহি' হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন। [মাওদু'আত আল-কুবরা]

এছাড়া আল্লামা আবদুল আলী বাহরুল উলূমও একে 'হাসান লি গাইরিহি' বলেছেন। আরো অনেক হাদিস দ্বারা এই হাদিসের বক্তব্য সমর্থিত হয়।

এর একটি হলো: “আমার সকল সাহাবা হচ্ছেন আদূল (ন্যায়নিষ্ঠ ও যথোপযুক্ত)”।

সুতরাং, হাদিস “আসহাবী কান নুযূম (আমার সাহাবী তারকাদের মতো)” দ্বীনে হুজ্জাত হিসাবে গ্রহণযোগ্য। এ সবকিছু একত্রিত করার পর আহনাফদের উসূল ক্বায়েম হলো এ কথাগুলোর মাধ্যমে: “দ্বীনের হুজ্জাত হলো সাহাবাদের আক্বওয়াল এবং সাহাবা নন এমন যে কোনো ব্যক্তির ইজতিহাদের ওপর এটি প্রাধান্য পাবে।”

ওয়াআল্লাহু আ’লাম

সাঈদ আহমদ

১০ মুহাররম ১৪১৭

দেওবন্দ।